হিমুর
দ্বিতীয় প্রহর

হিমুর দ্বিতীয় প্রহর

হুমায়ূন আহমেদ

কাকলী প্রকাশনী

প্রথম প্রকাশ

ফেব্রুয়ারী বইমেলা ১৯৯৭

C

গুলতেকিন আহমেদ

প্রকাশক

এ কে নাছির আহমেদ সেলিম

কাকলী প্রকাশনী

৩৮/4 বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

প্রচ্ছদ

সমর মজুমদার

কম্পিউটার কম্পোজ

গতিধারা কম্পিউটার

৩৮/4 বাংলাবাজার ঢাকা ১১০০

মুদ্রণ

এস. আর. প্রিন্টার্স

৭ শ্যামাপ্রসাদ চৌধুরী লেন ঢাকা ১১০০

পরিবেশক

সৃজনশীল পাবলিশার্স গিল্ড

৩৮/4 বাংলাবাজার ঢাকা ১১০০

দাম ৭৫ টাকা

ISBN 984 437 145 7

উৎসর্গ

জাহিদ হাসান, প্রিয় মানুষ

মানুষ হিসেবে সে আমাকে মুগ্ধ করেছে,
একদিন হয়ত অভিনয় দিয়েও মুগ্ধ করবে।
(দ্বিতীয় বাক্যটি দিয়ে তাকে রাগিয়ে দিলাম, হা হা হা।)

অনেকদিন থেকেই ভাবছিলাম হিমুর সঙ্গে মিসির আলীর দেখা করিয়ে দেব। দু'জন মুখোমুখি হলে অবস্থাটা কি হয় দেখার আমার খুব কৌতূহল। ম্যাটার ও এন্টিম্যাটার একসঙ্গে হলে যা হয় তাঁর নাম 'শুন্য'। মিসির আলী ও হিমুওতো এক অর্থে ম্যাটার ও এন্টিম্যাটার। দু'টি চরিত্রের ভেতর কোনটিকে আমি বেশী গুরুত্ব দিচ্ছি সেটা জানার জন্যেও এদের মুখোমুখি হওয়া দরকার। হিমুর দ্বিতীয় প্রহরে এদের মুখোমুখি করিয়ে দিলাম।

হুমায়ূন আহমেদ

২৫-২-৯৭

ভীতু মানুষ বলতে যা বোঝায় আমি তা না। হঠাৎ ইলেকট্রিসিটি চলে গিয়ে চারদিক অন্ধকার হয়ে গেলে আমার বুকে ধক করে ধাক্কা লাগে না। মাঝরাতে ঘুম ভেঙে যদি শুনি বাথরুমে ফিসফাস শোনা যাচ্ছে- কে যে হাঁটছে, গুন গুন করে গান গাইছে, কল ছাড়ছে-বন্ধ করছে, তাতেও আতঙ্কগ্রস্ত হই না। একবার ভূত দেখার জন্যে বাদলকে নিয়ে শ্মশানঘরে রাত কাটিয়েছিলাম। শেষরাতে ধুপধাপ শব্দ শুনেছি। চারদিকে কেউ নেই, অথচ ধুপধাপ শব্দ। ভয়ের বদলে আমার হাসি পেয়ে গেল। আমার বাবা তার পুত্রের মন থেকে ভয়'-নামক বিষয়টি পুরোপুরি দূর করার জন্যে নানান পদ্ধতির আশ্রয় নিয়েছিলেন। পদ্ধতিগুলি খুব যে বৈজ্ঞানিক ছিল তা বলা যাবে না, তবে পদ্ধতিগুলি বিফলে যায়নি। কাজ কিছুটা করেছে। চট করে ভয় পাই না।

রাতবিরেতে একা একা হাটি। কখনো রাস্তায় আলো থাকে, কখনো থাকে না। বিচিত্র সব মানুষ এবং বিচিত্র সব ঘটনার মুখোমুখি হয়েছি- কখনো আতঙ্কে অস্থির হইনি। তিন-চার বছর আগে এক বর্ষার রাতে ভয়ংকর একটা দৃশ্য দেখেছিলাম। রাত দুটা কিংবা তারচে কিছু বেশি বাজে। আমি কাঁটাবনের দিক থেকে আজিজ মার্কেটের দিকে যাচ্ছি। ঝুম বৃষ্টি হচ্ছে। চারপাশ জনমানব শুন্য। বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে এগুচ্ছি। খুবই মজা লাগছে। মনে হচ্ছে সোডিয়াম ল্যাম্পগুলি থেকে সোনালি বৃষ্টির ফোটা পড়ছে। হঠাৎ অবাক হয়ে দেখি- প্যান্ট এবং সাদা গেঞ্জি-পরা একজন মানুষ আমার দিকে ছুটে আসছে। রক্তে তার গেঞ্জি হাত-মুখ মাখামাখি- ছুরিতেও রক্ত লেগে আছে। বৃষ্টিতে সেই রক্ত ধুয়ে ধুয়ে যাচ্ছে। মানুষটা কি কাউকে খুন করে এদিকে আসছে? খুনি কখনো হাতের অস্ত্র সঙ্গে নিয়ে পালায় না। ব্যাপার কী? লোকটা থমকে আমার সামনে দাঁড়িয়ে

• • •

গেল। স্ট্রিট-লাইটের আলোয় আমি সেই মুখ দেখলাম। সুন্দর শান্ত মুখ, চোখ দুটিও মায়াকাড়া ও বিষণ্ন। লোকটির চিবুক বেয়ে টপটপ করে পানি পড়ছে। লোকটা চাপাগলায় বলল, কে? কে?

আমি বললাম, আমার নাম হিমু।

লোকটা কয়েক মুহূর্ত অপলক তাকিয়ে রইল। এই কয়েক মুহূর্তে অনেককিছু ঘটে যেতে পারত। সে আমার উপর ঝাঁপিয়ে পড়তে পারত। সেটাই স্বাভাবিক ছিল। অস্ত্রহাতে খুনি ভযংকর জিনিস। যে-অস্ত্র মানুষের রক্ত পান করে সেই অস্ত্রে প্রাণপ্রতিষ্ঠা হয়। সে বারবার রক্ত পান করতে চায়। তার তৃষ্ঞা মেটে না।

লোকটি আমার পাশ কাটিয়ে চলে গেল। আমি একই জায়গায় আরও কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকলাম ।

আমি খবরের কাগজ পড়ি না- পরদিন সবকটা কাগজ কিনে খুঁটিয়ে পড়লাম। কোনো হত্যাকাণ্ডের খবর কি কাগজে উঠেছে? ঢাকা নগরীতে নিউ এলিফ্যান্ট রোড এবং কাঁটাবন এলাকার আশেপাশে কাউকে কি জবাই করা হয়েছে? না, তেমনকিছু পাওয়া গেল না। গতরাতে আমি যে-জায়গায় দাঁড়িয়ে ছিলাম সেই জায়গায় আবার গেলাম । ছোপ-ছোপ রক্ত পড়ে আছে কিনা সেটা দেখার কৌতুহল। রক্ত দেখতে না পাওয়ারই কথা। কাল রাতে অঝোরে বৃষ্টি হয়েছে। যেসব রাস্তায় পানি ওঠার কথা না সেসব রাস্তাতেও হাঁটুপানি।

আমি তন্নতন্ন করে খুঁজলাম- না, রক্তের ছিটেফোঁটাও নেই। আমার অনুসন্ধান অনেকের দৃষ্টি আকর্ষণ করল। বাঙালির দৃষ্টি বড় কোনো ঘটনায় আকৃষ্ট হয় না, ছোট ছোট ঘটনায় আকৃষ্ট হয়। একজন এসে অমায়িক ভঙ্গিতে বললেন, ভাইসাহেব, কী খুঁজেন?

'কিছু খুঁজি না।'

ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে গেলেন। তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে আমার অনুসন্ধান দেখতে লাগলেন। তার দেখাদেখি আরও কয়েকজন দাঁড়িয়ে গেল। এরপর আর রক্তের দাগ খোঁজা অর্থহীন ।

• • •

আমি চলে এলাম। ঐ রাতের ঘটনা ভয় পাবার মতো ঘটনা তো বটেই— আমি ভয় পাইনি। বাবার ট্রেনিং কাজে লেগেছিল। কিন্তু ভয় আমি একবার পেয়েছিলাম। সেই ভয়ে রীতমিতো অসুস্থ হয়ে পড়েছিলাম। আমাকে হাসপাতালে ভরতি হতে হয়েছিল। ভয়াবহ ধরনের ভয় যা মানুষের বিশ্বাসে ভিত্তিমূল পর্যন্ত কাঁপিয়ে দেয়। যে-ভয়ের জন্ম এই পৃথিবীতে না, অন্য কোনো ভুবনে। ভয় পাবার সেই গল্পটি আমি বলব।

আমার বাবা আমার জন্যে কিছু উপদেশ লিখে রেখে গেছেন । সেই উপদেশগুলির একটি ভয়-সম্পর্কিত ।

> "একজন মানুষ তার একজীবনে অসংখ্যবার তীব্র ভয়ের মুখোমুখি হয়। তুমিও হইবে । ইহাই স্বাভাবিক। ভয়কে পাশ কাটাইয়া যাইবার প্রবণতাও স্বাভাবিক প্রবণতা। তুমি অবশ্যই তা করিবে না। ভয় পাশ কাটাইবার বিষয় নহে। ভয় অনুসন্ধানের বিষয়। ঠিকমতো এই অনুসন্ধান করিতে পারিলে জগতের অনেক অজানা রহস্য সম্পর্কে অবগত হইবে । তোমার জন্য ইহার প্রয়োজনীয়তা আছে। তবে তোমাকে বলিয়া রাখি, এই জগতের রহস্য পেঁয়াজের খোসার মতো। একটি খোসা ছাড়াইয়া দেখিবে আরেকটি খোসা। এমনভাবে চলিতে থাকিবে- সবশেষে দেখিবে কিছুই নাই। আমরা শূন্য হইতে আসিয়াছি, আবার শূন্যে ফিরিয়া যাইব । দুই শূন্যের মধ্যবর্তী স্থানে আমরা বাস করি। ভয় বাস করে দুই শূন্যে। এর বেশি এই মুহূর্তে তোমাকে বলিতে ইচ্ছা করি না।"

আমার বাবা, মহাপুরুষ তৈরির কারখানার চীফ ইঞ্জিনিয়ার সাহেব যদিও আমাকে বলেছেন ভয়কে পাশ না-কাটাতে, তবুও আমি ভয়কে পাশ কাটাচ্ছি। সব ভয়কে না-বিশেষ একটা ভয়কে । আচ্ছা, ঘটনাটা বলি ।

আমার তারিখ মনে নেই। ডিসেম্বরের মাঝামাঝি হতে পারে। শীত তেমন নেই। আমার গায়ে সুতির একটা চাদর। কানে ঠাণ্ডা লাগছিল বলে চাদরটা মাথার উপর

• • •

পেঁচিয়ে দিয়েছি। আমি বের হয়েছি পূর্ণিমা দেখতে। শহরের পূর্ণিমার অন্যরকম আবেদন। সোডিয়াম-ল্যাম্পের হলুদ আলোর সঙ্গে মেশে চাঁদের ঠাণ্ডা আলো। এই মিশ্র আলোর আলাদা মজা। তার উপর যদি কুয়াশা হয় তা হলে তো কথাই নেই। কুয়াশায় চাদের আলো চারদিকে ছড়ায়। সোডিয়াম-ল্যাম্পের আলো ছড়ায় না। মিশ্র আলোর একটি ছড়িয়ে যাচ্ছে, অন্যটি ছড়াচ্ছে না- খুবই ইন্টারেস্টিং!

সে-রাতে সামান্য কুয়াশাও ছিল। মনের আনন্দেই আমি শহরে ঘুরছি। পূর্ণিমার রাতে লোকজন সকাল-সকাল ঘুমিয়ে পড়ে। অবিশ্বাস্য হলেও ব্যাপারটা সত্যি। অল্পকিছু মানুষ সারারাত জাগে। তারা ঘুমুতে যায় চাঁদ ডোবার পরে।

ইংরেজিতে এই ধরনের মানুষদের একটা নাম আছে- Moon Struck. এরা চন্দ্রাহত । এদের চলাফেরায় ঘোর-লাগা ভাব থাকে। এরা কথা বলে অন্যরকম স্বরে। এরা কিন্তু ভুলেও চাঁদের দিকে তাকায় না। বলা হয়ে থাকে চন্দ্রাহত মানুষদের চাঁদের আলোয় ছায়া পড়ে না। এদের যখন আমি দেখি তখন তাদের ছায়ার দিকে আগে তাকাই ।

অনেকক্ষণ রাস্তায় হাঁটলাম । একসময় মনে হলো সোডিয়াম-ল্যাম্পের আলো বাদ দিয়ে জোছনা দেখা যাক। কোনো-একটা গলিতে ঢুকে পড়ি। দুটা রিকশা পাশাপাশি যেতে পারে না এমন একটা গলি। খুব ভালো হয় যদি অন্ধগলি হয়। আগে থেকে জানা থাকলে হবে না। হাঁটতে হাঁটতে শেষমাথায় চলে যাবার পর হঠাৎ দেখব পথ নেই। সেখানে সোডিয়াম-ল্যাম্প থাকবে না - শুধুই জোছনা।

ঢুকে পড়লাম একটা গলিতে। ঢাকা শহরের মাঝখানেই এই গলি। গলির নাম বলতে চাচ্ছি না। আমি চাচ্ছি না কৌতুহলী কেউ সেই গলি খুঁজে বের করুক। কিছুদূর এগুতেই কয়েকটা কুকুর চোখে পড়ল। এরা রাস্তার মাঝখানে কুণ্ডলী পাকিয়ে শুয়ে ছিল-আমাকে দেখে সবাই একসঙ্গে উঠে দাঁড়াল। সব মিলিয়ে চারটা কুকুর। কুকুরদের স্বভাব হচ্ছে সন্দেহজনক কাউকে দেখলে একসঙ্গে ঘেউঘেউ করে ওঠা । ভয় দেখানোর চেষ্টা । এরা তা করল না। এদের একজন সামান্য একটু এগিয়ে এসে থমকে দাঁড়াল।

•••

বাকি তিনজন তার পেছনে। সামনের কুকুরটা কি ওদের দলপতি? লীডারশিপ ব্যাপারটা কুকুরদের আদিগোত্র নেকড়েদের মধ্যে আছে- কুকুরদের নেই। তবে সামনের কুকুরটাকে লীডার বলেই মনে হচ্ছে। আমি ভাব জমাবার জন্য বললাম, তারপর, তোমাদের খবর কী? জোছনা কুকুরদের খুব প্রিয় হয় বলে শুনেছি, তোমাদের এই অবস্থা কেন? Is anything wrong?

কুকুরদের শরীর শক্ত হয়ে গেল। এর কেউ লেজ নাড়ছে না। কুকুর প্রচণ্ড রেগে গেলে লেজ নাড়া বন্ধ করে দেয়। লক্ষণ ভালো না ।

এদের অনুমতি না নিয়ে গলির ভেতর ঢুকে পড়া ঠিক হবে না। কাজেই বিনয়ী গলায় বললাম, যেতে পারি?

আমার ভাষা না বুঝলেও গলার স্বরের বিনয়ী অংশ বুঝতে পারার কথা। অধিকাংশ পশুই তা বোঝে ।

এরা নড়ল না। অর্থাৎ এরা চায় না আমি আর এগুই। তখন একটা কাণ্ড হলো— আমি স্পষ্টই শুনলাম কেউ-একজন আমাকে বলছে- তুমি চলে যাও। জায়গাটা ভালো না- তুমি চলে যাও। চলে যাও।

অবচেতন মনের কোনো খেলা? কোনো কারণে আমি নিজেই গলিতে ঢুকতে ভয় পাচ্ছি বলে আমার অবচেতন মন আমাকে চলে যেতে বলছে? না, ব্যাপারটা তা না। আমি না-ভাবার কোনো কারণ নেই। আসলেই গলির ভেতর ঢুকতে চাচ্ছি। আমাকে গলির ভেতরের জোছনা দেখতে হবে। তারচে বড় কথা হচ্চে আমি কোনো দুর্বল মনের মানুষ না যে অবচেতন মন আমাকে নিয়ে খেলবে। আর যদি খেলেও থাকে সেই খেলাকে প্রশ্রয় দেয়া যায় না। ধরে নিলাম অবচেতন মনই আমাকে চলে যেতে বলছে- অবচেতন মঙ্কে শোনানোর জন্যই স্পষ্ট করে বললাম, আমার এই গলিতে ঢোকা অত্যন্ত জরুরি। কুকুরগুলি একসঙ্গে আমাকে কামড়ে না ধরলে আমি অবশ্যই যাব।

তখন একটা কাণ্ড হলো। সবক'টা কুকুর একসঙ্গে পেছনের দিকে ফিরল। দলপতি কুকুরটা এগিয়ে গিয়ে দলপতির আসন নিল। তাদের দাঁড়ানোর ভঙ্গিতেও সামান্য

পরিবর্তন লক্ষ্য করলাম। পরিবর্তনটা কী বোঝার চেষ্টা করছি তখন অস্পষ্টভাবে লাঠির ঠকঠক আওয়াজ কানে এল। লাঠি-হাতে কেউ কি আসছে ? গ্রামের মানুষ সাপের ভয়ে লাঠি ঠকঠক করে যেভাবে পথে হাঁটে তেমন করে কেউ-একজন হাঁটছে। পাকা রাস্তায় লাঠির শব্দ। কুকুরদের শ্রবণেন্দ্রিয় অত্যন্ত তীক্ষ্ণ, তারা কি শব্দের মধ্যে বিশেষ কিছু পাচ্ছে? এদের মধ্যে একধরনের অস্থিরতা দেখা গেল। অস্থিরতা সংক্রামক। আমার মধ্যেও সেই অস্থিরতা ছড়িয়ে পড়ল। আর তখনই আমি জিনিসটা দেখলাম। লাঠি ঠকঠক করে একজন 'মানুষ' আসছে। তাকে মানুষ বলছি কেন? সে কি সত্যি মানুষ? সে কিছুদূর এসে থমকে দাঁড়াল। চারটা কুকুর একসঙ্গে ডেকে উঠে থেমে গেল। তারা একটু পিছিয়ে গেল ।

আমি দেখলাম রাস্তার ঠিক মাঝখানে যে দাঁড়িয়ে আছে তার চোখ, নাক, মুখ, কান কিছুই নেই। ঘাড়ের উপর যা আছে তা একদলা হলুদ মাংসপিণ্ড ছাড়া আরকিছু না । সেই মাংসপিণ্ডটা চোখ ছাড়াও আমাকে দেখতে পেল, সে লাঠিটা আমার দিকে উঁচু করল। আমি দ্বিতীয় যে-ব্যাপারটা লক্ষ্য করলাম তা হচ্ছে চাঁদের আলোয় লাঠিটার ছায়া পড়েছে, কিন্তু মানুষটার কোনো ছায়া পড়েনি। ধক করে নাকে পচা মাংসের গন্ধ পেলাম। বিকট সেই গন্ধ। পাকস্থলী উলটে আসার উপক্রম হলো।

আমার মাথার ভেতর আবারও কেউ-একজন কথা বলল, এখনও সময় আছে, দাঁড়িয়ে থেকো না, চলে যাও। এই জিনিসটা যদি তোমার দিকে হাঁটতে শুরু করে তা হলে তুমি আর পালাতে পারবে না। কুকুরগুলি তোমাকে রক্ষা করছে। আরও কিছুক্ষণ রক্ষা করবে। তুমি দৃষ্টি না ফিরিয়ে নিয়ে পেছন দিকে হাঁটতে শুরু করো। খবর্দার, এক পলকের জন্যেও দৃষ্টি অন্যদিকে ফেরাবে না। এবং মনে রেখে আর কখনো এই গলিতে ঢুকবে না। কখনো না। এই গলি তোমার জন্যে নিষিদ্ধ।

আমি আস্তে আস্তে পেছনদিকে হাঁটছি- কুকুরগুলিও আমার হাঁটার তালে তাল মিলিয়ে পেছন দিকে যাচ্ছে।

• • •

জিনিসটার কোনো চোখ নেই। চোখ থাকলে বলতাম— জিনিসটা আমার দিকে তাকিয়ে আছে। আশ্চর্য, চোখ ছাড়াও তা হলে দেখা যায়।

মাথার ভেতর আবারও কেউ-একজন কথা বলল, তুমি জিনিসটার সীমার বাইরে চলে এসেছ। জিনিসটার ক্ষমতা প্রচণ্ড । কিন্তু তার ক্ষমতার সীমা খুব ছোট। এই গলির বাইরে আসার তার ক্ষমতা নেই। তুমি এখন চলে যেতে পার।

আমি চলে গেলাম না। জিনিসটার দিকে তাকিয়ে রইলাম। সে তার লাঠি নামিয়ে ফেলেছে। যেদিক থেকে এসেছিল সেদিকে হাঁটতে শুরু করেছে। তার গায়ে কাঁথার মতো একটা মোটা কাপড়। এই কাপড়টাই শরীরে জড়ানো। সে হাঁটছে হেলেদুলে। একবার মনে হচ্ছে বামে হেলে পড়ে যাবে, আবার মনে হচ্ছে ডানে হেলে পড়ে যাবে। জিনিসটাকে এখন আগের চেয়ে অনেক লম্বা দেখাচ্ছে। যতই সে দূরে যাচ্ছে ততই লম্বা হচ্ছে। জিনিসটা আমার দৃষ্টিসীমার বাইরে চলে গেল। কুকুরগুলি ঠিক আগের জায়গায় গিয়ে শুয়ে পড়েছে। ওদের দলপতি শুধু একবার আমার দিক তাকিয়ে ঘেউঘেউ করল। মনে হয় কুকুরের ভাষায় বলল, যাও, বাসায় চলে যাও।

ডিসেম্বর মাসের শীতেও আমার শরীর ঘামছে। হাঁটার সময় লক্ষ্য করলাম ঠিকমতো পা ফেলতে পারছি না। রাস্তা কেমন উঁচুনিচু লাগছে। নতুন নতুন চশমা পরলে যা হয় তা-ই হচ্ছে। বুক শুকিয়ে কাঠ হয়ে আছে। কাচের জগভরতি একজগ ঠাণ্ডা পানি এক চুমুকে খেতে পারলে হতো। কার কাছে পানি চাইব? কিছুক্ষণ হাঁটার পর মনে হলো আমার দিক-ভুল হচ্ছে। আমি কোথায় আছি বুঝতে পারছি না। কোনদিকে যাচ্ছি তাও বুঝতে পারছি না। রিকশা চোখে পড়ছে না যে কোনো-একটা রিকশায় উঠে বসব। হোসহোস করে কিছু গাড়ি চলে যাচ্ছে। হাত তুলে দাঁড়িয়ে থাকলে এরা কেউ কি থামাবে? না, কেউ থামাবে না। ঢাকার গাড়ি-যাত্রীরা পথচারীর জন্যে গাড়ি থামায় না। নিয়ম নেই। আমি ফুটপাতেই বসে পড়লাম। আমার পক্ষে দাঁড়িয়ে থাকা সম্ভব ছিল না। অনেকক্ষণ ধরে বমি চেপে রেখেছিলাম। বসামাত্রই হড়হড় করে বমি হয়ে গেল।

‘আফনের কী হইছে?’

• • •

মাথা ঘুরিয়ে তাকালাম। ফুটপাতে বস্তা মুড়ি দিয়ে যারা ঘুমায় তাদের একজন। বস্তার ভেতর থেকে মাথা বের করেছে। তার গলায় মমতার চেয়ে বিরক্তি বেশি।

আমি বললাম, শরীর ভালো না।

'মিরগি ব্যারাম আছে?'

'না। পানি খাওয়া যাবে? পানি খাওয়া দরকার।'

'রাইতে পানি কই পাইবেন।'

'রাতে পানির পিপাসা পেলে আপনারা পানি কোথায় পান?'

লোকটা বস্তার ভেতর মাথা ঢুকিয়ে দিল । আমার উদ্ভট প্রশ্নে সে হয়তো বিরক্ত হচ্ছে। প্রশ্নটা তেমন উদ্ভট ছিল না। এই যে অসংখ্য মানুষ ফুটপাতে ঘুমায়, রাতে পানির তৃষ্ণা পেলে তারা পানি পায় কোথায়?

ক'টা বাজছে জানা দরকার। রাত শেষ হয়ে গেলে রিকশা, বেবিট্যাক্সি চলা শুরু করবে- তখন আমার একটা গতি হলেও হতে পারে। বিটের পুলিশও দেখছি না। পূর্ণিমরাতে বোধহয় বিটের পুলিশ বের হয় না।

আমি বস্তা মুড়ি-দেয়া লোকটার দিকে তাকিয়ে ডাকলাম, ভাইসাহেব! এই যে ভাইসাহেব! এই যে বস্তা-ভাইয়া!

একা বসে থাকতে ভালো লাগছে না। কারও সঙ্গে কথা বলতে ইচ্ছা করছে। বমি হয়ে যাওয়ায় শরীরটা একটু ভালো লাগছে, তবে ভয়টা মাথার ভেতরে ঢুকে আছে। কারও সঙ্গে কথাটথা বলতে থাকলে হয়তো-বা তাকে ভুলে থাকা যাবে। আমি গলা উচিয়ে ডাকলাম, এই যে বস্তা-ভাই, ঘুমিয়ে পড়লেন?

লোকটা বিরক্তমুখে বস্তার ভেতর থেকে মুখ বের করল।

'কী হইছে?'

'এটা কোন জায়গা? জায়গাটার নাম কী?'

'চিনেন না?'

'জি না।'

• • •

‘বুঝছি, মাল খাইয়া আইছেন। আরেক দফা গলাত আঙ্গুল দিয়া বমি করেন— শইল ঠিক হইব। আরেকটা কথা কই ভাইজান, আমারে ত্যক্ত করবেন না।’

‘রাত কত হয়েছে বলতে পারেন? ’

‘জে না, পারি না।’

লোকটা আবার বস্তার ভেতর ঢুকে গেল । লোকটার পাশে খালি জায়গায় শুয়ে পড়ব? গায়ে চাদর আছে। চাদরের ভেতর ঢুকে পড়ে বাকি রাতটা পার করে দেয়া যায়। রেলস্টেশনের প্ল্যাটফর্মে শুয়ে অনেক রাত কাটিয়েছি। গাছের তলায় ঘুমিয়েছি। ফুটপাতে ঘুমানো হয়নি।

বস্তা-ভাইয়ের পাশে শুয়ে পড়ার আগে কি তার অনুমতি নেয়ার দরকার আছে? ফুটপাতে যারা ঘুমোয় তাদের নিয়মকানুন কী? তাদেরও নিশ্চয়ই অলিখিত কিছু নিয়মকানুন আছে? ফুটপাতে অনেক পরিবার রাত কাটায়- স্বামী-স্ত্রী ছেলেমেয়ের সোনার সংসার। সেইরকম কোনো পরিবারের পাশে নিশ্চয়ই উঠকো ধরনের কেউ মাথার নিচে ইট বিছিয়ে শুয়ে পড়তে পারে না?

‘বস্তা-ভাই। এই যে বস্তা-ভাই!’

‘আবার কী হইছে?’

‘আপনার পাশের ফাঁকা জায়গাটায় কি শুয়ে পড়তে পারি? যদি অনুমতি দেন।'

বস্তা-ভাই জবাব দিলেন না, তবে সরে গিয়ে খানিকটা জায়গা করলেন। এই প্রথম লক্ষ করলাম-বস্তা-ভাই একা ঘুমাচ্ছেন না, তার সঙ্গে তার পুত্রও আছে। তিনি পুত্রকেও নিজের দিকে টানলেন এবং কঠিন গলায় বললেন, বস্তা-ভাই বস্তা-ভাই করতেছেন কেন? ইয়ারকি মারেন? গরিবরে লইয়া ইয়ারকি করতে মজা লাগে?

‘না রে ভাই, ইয়ারকি করছি না। গরিব নিয়ে ইয়ারকি করব কী, আমিও আপনাদের দলে । মুখভরতি বমি। মুখ না ধুয়ে ঘুমুতে পারব না। পানি কোথায় পাব বলে দিন। একটু দয়া করুন।’

• • •

বস্তা-ভাই দয়া করলেন। আঙুল উঁচিয়ে কী যেন দেখালেন। আমি এগিয়ে গেলাম। সম্ভবত কোনো চায়ের দোকান। দোকানের পেছনে জালাভরতি পানি । মিনারেল ওয়াটারের একটা খালি বোতলও আছে। আমি পানি দিয়ে মুখ ধুলাম। দুই বোতলের মতো পানি খেয়ে ফেললাম। এক বোতল পানি ঢেলে দিলাম গায়ে । ভয়-নামক যে ব্যাপারটা শরীরে জড়িয়ে আছে- পানিতে তা ধুয়ে ফেলার একটা চেষ্টা। তারপর শীতে কাঁপতে কাঁপতে আমি শুয়ে পড়লাম। সঙ্গে সঙ্গে ঘুমে চোখ জড়িয়ে গেল। আমি তলিয়ে গেলাম গভীর ঘুমে। কোনো এক পর্যায়ে কেউ-একজন সাবধানে আমার গায়ের চাদর তুলে নিয়ে চলে গেল। তাতেও আমার ঘুম ভাঙল না। সারারাত আমার গায়ে চাদের আলোর সঙ্গে পড়ল ঘন হিম । যখন ঘুম ভাঙল তখন আমার গায়ে আকাশ-পাতাল জ্বর। নিশ্বাস পর্যন্ত নিতে পারছি না। দিনের আলোয় রাতের ভয়টা থাকার কথা না, কিন্তু লক্ষ্য করলাম ভয়টা আছে। গুটিসুটি মেরে ছোট হয়ে আছে। তবে সে ছোট হয়ে থাকবে না। যেহেতু সে একটা আশ্রয় পেয়েছে সে বাড়তে থাকবে।

জ্বরে আমার শরীর কাঁপছে। চিকিৎসা শুরু হওয়া দরকার। সবচে ভালো বুদ্ধি হাসপাতালে ভরতি হয়ে যাওয়া। হাসপাতালে ভরতির নিয়মকানুন কী? দরখাস্ত করতে হয়? নাকি রোগীকে উপস্থিত হয়ে বলতে হয়- আমি হাসপাতালে ভর্তি হবার জন্য এসেছি? আমার রোগ গুরুতর। বিশ্বাস না হলে পরীক্ষা করে দেখুন। চিকিৎসার চেয়ে আমার যেটা বেশি দরকার তা হচ্ছে সেবা। ঘরে সেবা করার কেউ নেই। হাসপাতালের নার্সরা নিশ্চয়ই সেবাও করবেন। গভীর রাতে চার্জ-লাইট হাতে নিয়ে বিছানায়-বিছানায় যাবেন, রোগের প্রকোপ কেমন দেখবেন। স্যার, দয়া করে আমকে ভরতি করিয়ে নিন।

হাসপাতালে ভরতি হওয়া যতটা জটিল হবে ভেবেছিলাম দেখা গেল ব্যাপারটা মোটেই তত জটিল না। একজনকে দেখলাম দুটাকা করে কী-একটা টিকিট বিক্রি করছে। খুব কঠিন ধরনের চেহারা। সবাইকে ধমকাচ্ছে। তাকে বললাম, ভাই আমার এই মুহূর্তে হাসপাতালে ভরতি হওয়া দরকার। কী করতে হবে একটু দয়া করে বলে দিন ।

• • •

সে বিস্মিত হয়ে বলল, হাসপাতালে ভরতি হবেন?

‘জি ।’

‘নিয়ে এসেছে কে আপনাকে?’

‘কেউ নিয়ে আসেনি। আমি নিজে নিজেই চলে এসেছি। আমি আর বেশিক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে পারব না। মাথা ঘুরে পড়ে যাব।’

‘আপনার হয়েছে কী?’

'ভূত দেখে ভয় পেয়েছি। ভয় থেকে জ্বর এসে গেছে।’

‘ভূত দেখেছেন?’

‘জি স্যার।’

‘আমার কাছে এসেছেন কেন? আমি তো আউটডোর পেশেন্ট রেজিস্ট্রেশন স্লিপ দিই।’

‘কার কাছে যাব তা তো স্যার জানি না।’

‘আচ্ছা, আপনি বসুন ঐ টুলটায়।’

‘টুলে বসতে পারব না। মাথা ঘুরে পড়ে যাব। আমি বরং মাটিতে বসি।'

‘আচ্ছা বসুন।’

‘থ্যাংক য়্যু স্যার।’

‘আমাকে স্যার বলার দরকার নেই। যাদের স্যার বললে কাজ হবে তাদের বলবেন।'

‘আপনাকে বলাতেও কাজ হয়েছে। আপনি ব্যবস্থা করে দিচ্ছেন।'

‘আমি ব্যবস্থা করব কী? আমি দুই পয়সার কেরানি। আমার কি সেই ক্ষমতা আছে? যারা ব্যবস্থা করতে পারবেন তাদের কাছে নিয়ে যাব- এইটুকু।'

‘স্যার, এইটুকুই-বা কে করে।’

এই লোক আমাকে একজন তরুণী-ডাক্তারের নিয়ে গেল। খুবই ধারালো চেহারা। কথাবার্তাও ধারালো। আমি এই তরুণীর কঠিন জেরার ভেতর পড়ে গেলাম।

‘আপনার নাম কী?’

• • •

'ম্যাডাম, আমার নাম হিমু।'

'আপনার ব্যাপার কী?'

'ম্যাডাম, আমি খুবই অসুস্থ। আমার এক্ষুনি হাসপাতালে ভরতি হওয়া দরকার। ভূত দেখে ভয় পেয়ে অসুস্থ হয়ে পড়েছি।'

'আপনি অসুস্থ। আপনার চিকিৎসা হওয়া দরকার- আপনি হাসপাতলে ভরতি হতে চান- খুব ভালো কথা। দরিদ্র দেশের সীমিত সুযোগ-সুবিধার ভেতর যতটুকু করা যায় আপনার জন্যে ততটুকু করা হবে। হাসপাতালে সিট নেই। আপনার কি ধারণা হোটেলের মতো আমরা বিছানা সাজিয়ে বসে আছি! আপনাদের জ্বর হবে, সর্দি হবে- আপনারা এসে বিছানায় শুয়ে পড়বেন— নার্সকে ডেকে বলবেন, কোলবালিশ দিয়ে যাও। এই আপনার ধারণা?'

'জি না ম্যাডাম।'

'আপনি কি ভেবেছেন উদ্ভট একটা গল্প বললেই আমরা আপনাকে ভরতি করিয়ে নেব? ভূত দেখে জ্বর এসে গেছে? রসিকতা করার জায়গা পান না!'

'ম্যাডাম, সত্যি দেখেছি। আপনি চাইলে আমি পুরো ঘটনা বলতে পারি।'

'আমি আপনার ঘটনা শুনতে চাচ্ছি না।'

'ম্যাডাম, আপনি কি ভুত বিশ্বাস করেন না?'

'আপনি দয়া করে কথা বাড়াবেন না।'

'শেকসপীয়ারের মতো মানুষও কিন্তু ভূত বিশ্বাস করতেন। তিনি হ্যামলেটে বলেছেন- There are many things in heaven and earth. আমার ধারণা তিনি ভূত দেখেছেন। এদিকে আমাদের রবীন্দ্রনাথ তার জীবনস্মৃতিতে উল্লেখ করেছেন-'

'স্টপ ইট!'

'আমি স্টপ করলাম।'

তরুণী-ডাক্তার আমাকে যে-লোকটি নিয়ে এসেছিল (নাম রশিদ) তার দিকে কঠিন চোখে তাকালেন। রশিদ বেচারা জোকের মুখে লবণ পড়ার মতো মিইয়ে গেল।

• • •

'রশিদ!'

'জি আপা?'

'একে এখান থেকে নিয়ে যাও। ফালতু ঝামেলা আমার কাছে আর কখনো আনবে না।'

আমি উঠে দাঁড়ালাম এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই মাথা ঘুরে অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেলাম। জ্ঞান যখন ফিরল তখন দেখি আমি হাসপাতালের একটা বিছানায় শুয়ে আছি । আমাকে স্যালাইন দেয়া হচ্ছে। তরুণী-ডাক্তার আমার মুখের উপর ঝুঁকে আছেন। চোখ মেলতেই তিনি বললেন, হিমু সাহেব, এখন কেমন বোধ করছেন?

'ভালো ।'

এইটুকু বলে আমি দ্বিতীয়বারের মতো জ্ঞান হারালাম, কিংবা গভীর ঘুমে তলিয়ে গেলাম।

হাসপাতালের তৃতীয় দিনে আমাকে দেখতে এলেন বড় ফুপা- বাদলের বাবা। তার হাতে এক প্যাকেট আঙুর। একটা সময় ছিল যখন মৃত্যুপথযাত্রীকে দেখতে যাবার সময় আঙুর নিয়ে যাওয়া হতো। ফলের দোকানি আঙুর বিক্রির সময় মমতামাখা গলায় বলত- রুগির অবস্থা সিরিয়াস?

এখন আঙুর একশো টাকা কেজি- বরই বরং এই তুলনায় দামি ফল।

বড় ফুপা আমার পাশে বসতে বসতে বললেন, অবস্থা কী?

আমি জবাব দিলাম না। কেউ রোগী দেখতে এসে যদি দেখে রোগী দিব্যি সুস্থ, পা নাচাতে নাচাতে হিন্দি গান গাইছে— তখন সে শকের মতো পায় । যদি দেখে রোগীর অবস্থা এখন-তখন, শ্বাস যায়-যায় অবস্থা, তখন মনে শান্তি পায়- যাক, কষ্ট করে আসাটা বৃথা যায়নি। কাজেই ফুপার প্রশ্নে আমি চোখমুখ করুণ করে ফেললাম, শ্বাস নিতেও কষ্ট হচ্ছে এরকম একটা ভাবও করলাম।

'জবাব দিচ্ছিস না কেন? অবস্থা কী?'

• • •

আমি ক্ষীণস্বরে বললাম, ভালো। এখন একটু ভালো ।

‘তোকে খুঁজে বের করতে খুবই যন্ত্রণা হয়েছে, কোন ওয়ার্ড, বেড নাম্বার কী কেউ জানে না।'

‘ও আচ্ছা।’

‘একবার তো ভেবেছি ফিরেই চলে যাই। নেহায়েত আঙুর কিনেছি বলে যাইনি। আঙুর খেতে নিষেধ নেই তো?’

‘জি না।’

‘নে, আঙুর খা।'

আমি টপাটপ আঙুর মুখে ফেলছি আর ভাবছি- ব্যাপারটা কী? আমি যে হাসপাতালে, এই খোঁজ ফুপা পেলেন কোথায়? কাউকেই তো জানানো হয়নি। আমি বিরাট রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব না যে খবরের কাগজে নিউজ চলে গেছে-

হিমুর সর্দিজ্বর

জনদরদি দেশনেতা প্রাণপ্রিয় হিমু সর্দিজ্বরে আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন আছেন। প্রধানমন্ত্রী গতকাল সন্ধ্যায় তাকে দেখতে যান। কিছুক্ষণ তার শয্যাপার্শ্বে থেকে তার আশু আরোগ্য-কামনা করেন। মন্ত্রিপরিষদের কয়েকজন সদস্যও প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে ছিলেন। মন্ত্রিপরিষদের সদস্যদের মধ্যে ছিলেন বনমন্ত্রী, তেল ও জ্বালানি মন্ত্রী, ত্রাণ উপমন্ত্রী। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ জানাচ্ছেন- হিমু সাহেবের শারীরিক অবস্থা এখন ভালো। হিমু সাহেবের ভক্তবৃন্দের চাপে হাসপাতালের স্বাভাবিক কার্যক্রম ব্যাহত হচ্ছে। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ তাদের প্রতি অনুরোধ জানাচ্ছেন তারা যেন হিমু সাহেবকে বিরক্ত না করেন। হিমু সাহেবের দরকার পরিপূর্ণ বিশ্রাম। তাঁর শরীরের বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে বুলেটিন প্রতিদিন দুপুর বারোটায় প্রকাশ করা হবে।

• • •

আমি যে হাসপাতালে এই খবর আমার কাঁধের দুই ফেরেশতা ছাড়া আর কারোরই জানার কথা না। ধরা যাক খবরটা সবাই জানে, তার পরেও ফুপা হাসপাতালে চলে আসবেন এটা হয় না। এত মমতা আমার জন্যে বাদল ছাড়া আর কারোরই নেই। অন্যকোনো ব্যাপার আছে। ব্যাপারটা কী?

'ফুপা, আমি যে হাসপাতালে এটা জানলেন কীভাবে? পেপারে নিউজ হয়েছে?'

'পেপারে নিউজ হবে কেন? তুই কে? হাসপাতাল থেকে আমাকে টেলিফোন করেছে।'

'আপনার নাম্বার ওরা পেল কোথায়?'

'তুই দিয়েছিস।'

আমার মনে পড়ল কোনো একসময় হাসপাতালে ভরতির ফরম তরুণী-ডাক্তার নিয়ে এসেছিলেন। তিনি নিজেই ফিলআপ করেছেন এবং আগ বাড়িয়ে অসুখের খবর দিয়েছেন ।

'খুব মিষ্টি গলার একজন মেয়ে-ডাক্তার আপনাকে খবর দিয়েছে, তা-ই না?'

'হু। তোর সম্পর্কে জানতে চাচ্ছিল।'

'কী জানতে চাচ্ছিল?'

'তুই কী করিস না-করিস এইসব। তোর হলুদ পাঞ্জাবি, উদ্ভট কথাবার্তা শুনে ভড়কে গেছে আর কি। তুই আর কিছু পারিস বাঁ না পারিস মানুষকে ভড়কাতে পারিস।

'ডাক্তাররা এত সহজে ভড়কায় না। তারপর বলুন ফুপা, আমার কাছে কেন এসেছেন।'

'তোকে দেখতে এসেছি আর কি।'

'আমাকে দেখতে হাসপাতালে চলে আসবেন এটা বিশ্বাসযোগ্য না। ঘটনা কী?'

'বাদলের ব্যাপারে তোর সঙ্গে একটু কথা ছিল।'

ফুপা ইতস্তত করে বললেন।

• • •

আমি শান্ত গলায় বললাম, বাদলকে নিয়ে তো আপনার এখন দুশ্চিন্তার কিছু নেই। সে কানাডায় আমার প্রভাববলয় থেকে অনেক দূরে। আমার হাত থেকে তাকে রক্ষা করার কোনো দায়িত্বও আপনাকে পালন করতে হচ্ছে না। নাকি সে কানাডাতেও খালি পায়ে হাঁটা শুরু করেছে?

ফুপা চাপাগলায় বললেন, বাদল এখন ঢাকায়।

'ও আচ্ছা।'

'মাসখানিক থাকবে। তোর কাছে আমার অনুরোধ, এই এক মাস তুই গা-ঢাকা দিয়ে থাকবি । ওর সঙ্গে দেখা করবি না।'

'গা-ঢাকা দিয়েই তো আছি। হাসপাতালে লুকিয়ে আছি।'

হাসপাতালে তো আর এক মাস থাকবি না, তোকে নাকি আজকালের মধ্যেই ছেড়ে দেবে।'

'আমাকে বাদলের কাছ থেকে একশো হাত দূরে থাকতে হবে, তা-ই তো?'

'হ্যাঁ।'

'নো প্রবলেম।'

'শোন হিমু, আমরা চাচ্ছি ওর একটা বিয়ে দিতে। মোটামুটি নিমরাজি করিয়ে ফেলেছি। এখন তুই যদি ভুজংভাজং দিস তা হলে তো আর বিয়ে হবে না। সে হলুদ পাঞ্জাবি পরে হাঁটা দেবে।'

'আমি কেন ভুজংভাজং দেব?'

'তোকে দিতে হবে না। তোকে দেখলেই ওর মধ্যে আপনা-আপনি ভুজংভাজং হয়ে যাবে। অনেক কষ্টে তাকে নরম্যাল করেছি, সব জলে যাবে।'

'আপনি নিশ্চিন্ত হয়ে থাকুন।'

'কথা দিচ্ছিস?'

'হ্যাঁ।'

• • •

‘বাদল এয়ারপোর্টে নেমেই বলেছে- হিমুদা কোথায়? আমি মিথ্যা করে বলেছি, সে কোথায় কেউ জানে না ।’

‘ভালো বলেছেন।’

‘মেসের ঠিকানা চাচ্ছিল- তোর আগের মেসের ঠিকানা দিয়ে দিয়েছি।’

‘খুবই ভালো করেছেন, আগের ঠিকানায় খোজ নিতে গিয়ে ঠক খাবে।’

‘খোঁজ নিতে এর মধ্যেই গিয়েছে। ছেলেটাকে নিয়ে কী যে দুশ্চিন্তায় আছি। বিয়েটা দিয়ে দিতে পারলে নিশ্চিন্ত । আমাকে আর চিন্তা করতে হবে না। চিন্তাভাবনা যা করার বৌমা করবে।’

‘বিয়ে ঠিকঠাক করে ফেলেছেন?’

‘কয়েকটা মেয়ে দেখা হয়েছে- এর মধ্যে একটাকে তোর ফুপুর পছন্দ হয়েছে। মেয়ের নাম হলো- চোখ।’

‘মেয়ের নাম চোখ।'

‘হ্যাঁ, চোখ। আজকাল কি নামের কোনো ঠিকঠকানা আছে যার যা ইচ্ছা নাম রাখছে।’

‘চোখ নাম হবে কীভাবে আঁখি না তো?’

‘ও হ্যাঁ, আঁখি । সুন্দর মেয়ে- ফড়ফড়ানি-টাইপ। একটা কথা জিজ্ঞেস করলে তিনটা কথা বলে। বাদলের সঙ্গে মানাবে। একজন কথা বলে যাবে, একজন শুনে যাবে।’

‘মেয়ে আপনার পছন্দ না?’

‘তোর ফুপুর পছন্দ। পুরষমানুষের কি সংসারে কোনো say থাকে? থাকে না। পুরুষরা পেপার-হেড হিসেবে অবস্থান করে। নামে কর্তা, আসলে ভর্তা। তুই বিয়ে না করে খুব ভালো আছিস । দিব্যি শরীরে বাতাস লাগিয়ে ঘুরছিস । তোকে দেখে হিংসা হয়। স্বাধীনতা কী জিনিস, তার কী মর্ম-সেটা বোঝে শুধু বিবাহিত পুরুষরাই। উঠিরে হিমু।’

‘আচ্ছা।’

• • •

'বাদলের প্রসঙ্গে যা বলেছি মনে থাকে যেন।'

'মনে থাকবে।'

'ও আচ্ছা। তোর অসুখের ব্যাপারটাই তো কিছু জানলাম না! কী অসুখ?'

'ঠাণ্ডা লেগেছে।'

'ঠাণ্ডা লাগল কীভাবে?'

'ফুটপাতে চাদর-গায়ে শুয়েছিলাম। চোর চাদর নিয়ে গেল।'

'ফুটপাতে ঘুমুচ্ছিলি?'

'জি ।'

'ঘরে ঘুমুতে আর ভালো লাগে না?'

'তা না-'

'শোন হিমু, বাদলের কাছ থেকে দূরে থাকবি। মনে থাকে যেন।'

'মনে থাকবে ।'

'টাকাপয়সা কিছু লাগবে? লাগলে বল, লজ্জা করিস না। ধর পাঁচশো টাকা রেখে দে। অষুধপত্র কেনার ব্যাপার থাকতে পারে।'

আমি নোটটা রাখলাম। ফুপা চিন্তিত ভঙ্গিতে বের হয়ে গেলেন। ছেলে আমার ফাঁদে পড়ে যদি আবার ফুটপাতে শয্যা পাতে। কিছুই বলা যায় না।

হাসপাতাল আমার বেশ পছন্দ হলো। হাসপাতালের মানুষগুলির ভেতর একটা মিল আছে। সবাই রোগী। রোগযন্ত্রণায় কাতর। ব্যাধি সব মানুষকে এক করে দিয়েছে। একজন সুস্থ মানুষ অপরিচিত একজন সুস্থ মানুষের জন্যে কোনো সহমর্মিতা বোধ করবে না, কিন্তু একজন অসুস্থ মানুষ অন্য একজন অসুস্থ মানুষের জন্যে করবে।

হাসপাতালে খাওয়াদাওয়ার ব্যাপারটা নিয়েও ভাবতে হচ্ছে না। সকালে নাশতা আসছে। দুবেলা খাবার আসছে। দুনম্বরি ব্যবস্থাও আছে। জায়গামতো টাকা খাওয়ালে স্পেশাল ডায়েটের ব্যবস্থা হয়। ডাক্তারদের অনেক সংস্থাটংস্থা আছে। করুণ গলায়

• • •

তরুণ ডাক্তারদের কাছে অভাবের কথা বলতে পারলে ফ্রি অষুধ তো পাওয়া যায়ই, পথ্য কেনার টাকাও পাওয়া যায়।

রোগ সেরে গেছে, তার পরেও কিছুদিন হাসপাতালে থেকে শরীর সারাবার ব্যবস্থাও আছে। খাতাপত্রে নাম থাকবে না- কিন্তু বেড থাকবে। এক-একদিন এক-এক ওয়ার্ডে গিয়ে ঘুমুতে হবে। ছেলেমেয়ে নিয়ে গত সাত মাস ধরে হাসপাতালে বাস করছে এমন একজনের সন্ধানও পাওয়া গেল। নাম ইসমাইল মিয়া । স্ত্রীর ক্যানসার হয়েছিল, তাকে হাসপাতালে ভরতি করিয়ে মাসখানিক চিকিৎসা করাল। সেই ইসমাইল মিয়ার হাসপাতালের সঙ্গে পরিচয়। ধীরে ধীরে পুরো পরিবার নিয়ে সে হাসপাতালে পার হয়ে গেল। স্ত্রী মরে গেছে। তাতে অসুবিধা হয়নি। বাচ্চারা হাসপাতালের বারান্দায় খেলে। এক ওয়ার্ড থেকে আরেক ওয়ার্ডে ঘোরে। কেউ কিছু বলে না। ইসমাইল মিয়া দিনে বাইরে কাজকর্ম করে (মনে হয় দুনম্বরি কাজ– চুরি, ফটকাবাজি)। রাতে হাসপাতালে এসে ছেলেমেয়েদের খুঁজে বের করে । ঘুমানোর একটা ব্যবস্থা করে ।

ইসমাইল মিয়ার সঙ্গে পরিচয় হলো। অতি ভদ্র। অতি বিনয়ী ! হাসিমুখ ছাড়া কথা বলে না। তার মধ্যে দার্শনিক ব্যাপারও আছে। আমি বললাম, হাসপাতালে আর কতদিন থাকবে?

ইসমাইল দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বলল, ক্যামনে বলি ভাইজান? আমার হাতে তো কিছু নাই ।

'তোমার হাতে নেই কেন?'

'সব তো ভাইজান আল্লাহপাকের নির্ধারণ। আল্লাহপাক নির্ধারণ করে রেখেছে আমি বালবাচ্চা নিয়া হাসপাতালে থাকব- এইজন্যে আছি। যেদিন নির্ধারণ করবেন আর দরকার নাই- সেইদিন বিদায়।'

'আল্লাহপাকের হুকুম ছাড়া তো ভাইজান কিছুই হওনের উপায় নাই।'

'তাও ঠিক।'

• • •

‘সামান্য যে পিপীলিকা- আল্লাহপাক তারও খবর রাখেন। আপনার পায়ের তলায় পইরা দুইটা পিপীলিকার মৃত্যু হবে তাও আল্লাহপাকের বিধান। আজরাইল আলাইহেস সালাম আল্লাহপাকের নির্দেশে দুই পিপীলিকার জান কবজ করবে।’

‘ও আচ্ছা।'

‘এইজন্যেই ভাইজান কোনোকিছু নিয়া চিন্তা করি না। যার চিন্তা করার কথা সে-ই চিন্তা করতেছে। আমি চিন্তা কইরা কী করব।’

‘কার চিন্তা করার কথা?’

‘কার আবার, আল্লাহপাকের।’

ইসমাইল মিয়া খুবই আল্লাহভক্ত। সমস্যা হচ্ছে তার প্রধান কাজ- চুরি । চুরির পক্ষেও সে ভালো যুক্তি দাঁড় করিয়েছে-

‘চুরিতে আসলে কোনো দোষ নাই ভাইজান। ভালুক কী করে? পেটে খিদা লাগলে মৌমাছির মৌচাক থাইক্যা মধু চুরি করে। এর জন্যে ভালুকের দোষ হয় না। এখন বলেন মানুষের দোষ হইব ক্যান।’

বগার মা নামের এক বৃদ্ধার সঙ্গেও পরিচয় হলো। তিনি ঝাড়ফুঁক করেন। ঝাটার কাঠি নিয়ে রোগীদের ঝাড়েন। তাতে নাকি অতি দ্রুত রোগ আরোগ্য হয়। হাসপাতালে সর্বাধুনিক চিকিৎসার সাথে সাথে চলে ঝাড়ফুঁক।

এই বৃদ্ধা দশ টাকার বিনিময়ে আমাকেও একদিন ঝেড়ে গেলেন। আমি দশ টাকার বাইরে আরও পঞ্চাশ টাকা দিয়ে ঝাড়ার মন্ত্র খাকিটা শিখে নিলাম।

‘ও কালী সাধনা
বিষ্টু কালী মাতা ।
উত্তর দক্ষিণ, পূর্ব পশ্চিম।
রও নাও— ঈশানে যাও ।
........’

• • •

বগার মা'র সঙ্গে অনেক গল্পগুজব করলাম। জানা গেল বগা বলে তার কোনো ছেলে বা মেয়ে নেই। তার তিনবার বিয়ে হয়েছিল। কোনো ঘরেই কোনো সন্তান হয়নি। কী করে তার নাম বগার মা হয়ে গেল তিনি নিজেও জানেন না ।

আমি বললাম, মা, ঝাড়ফুঁকে রোগ সারে?

বগার মা অতি চমৎকৃত হয়ে বললেন, কী কও বাবা! ঠিকমতো ঝাড়তে পারলে ক্যানসার সারে ।

'আপনি সারিয়েছেন?'

'অবশ্যই– ত্রিশ বচ্ছর ধইরা ঝাড়তেছি। ত্রিশ বচ্ছরে ক্যানসার ম্যানসার কতকিছু ভালো কইরেছি। একটা কচকা ঝাড়া দশটা "পেনিসিলি" ইনজেকশনের সমান। বাপধন, তোমারে যে ঝাড়া দিলাম এই ঝাড়ায় দেখবা আইজ দিনে-দিনে সিধা হইয়া দাঁড়াইবা।'

হাসপাতালে আমি অনেক কিছুই শিখলাম। হাসপাতালের ব্যাপারটা সম্ভবত আমার বাবার চোখ এড়িয়ে গিয়েছিল। নয়তো তিনি অবশ্যই তার পুত্রকে কিছুদিন হাসপাতালে রেখে দিতেন। এবং তার বিখ্যাত উপদেশমালার সঙ্গে আরও একটি উপদেশ যুক্ত হতো-

> 'প্রতি দুই বৎসর অন্তর হাসপাতালে সাতদিন থাকিবার ব্যবস্থা করিবে। মানুষের জরা-ব্যাধি ও শোক তাহাদের পার্শ্বে থাকিয়া অনুধাবন করিবার চেষ্টা করিবে। ব্যাধি কী, জীবজগৎকে ব্যাধি কেন বারবার আক্রমণ করে তাহা বুঝিবার চেষ্টা করিবে । তবে মনে রাখিও, ব্যাধিকে ঘৃণা করিবে না। ব্যাধি জীবনেরই অংশ। জীবন আছে বলিয়াই ব্যাধি আছে।'

'কেমন আছে হিমু সাহেব।'

'জি ম্যাডাম, ভালো আছি।'

• • •

‘আপনার বুকে কনজেশন এখনও আছে। অ্যান্টিবায়োটিক যা দেয়া হয়েছে কনটিনিউ করবেন। সেরে যাবে।’

‘থাংক য়্যু ম্যাডাম।'

‘আপনাকে রিলিজ করে দেয়া হয়েছে, আপনি চলে যেতে পারেন।'

‘থ্যাংক য়্যু ম্যাডাম।’

‘ প্রতিটি বাক্যে একবার করে ম্যাডাম বলছেন কেন? ম্যাডাম শব্দটা আমার পছন্দ না। আর বলবেন না।’

‘জি আচ্ছা, বলব না।’

‘আপনার হাতে কি সময় আছে? সময় থাকলে আমার চেম্বারে আসুন। আপনার সঙ্গে কিছুক্ষণ গল্প করি।'

‘জি আচ্ছা।’

আমি তরুণী-ডাক্তারের পেছনে পেছনে যাচ্ছি। তার নাম ফারজানা। সুন্দর মানুষকেও সবসময় সুন্দর লাগে না। কখনো খুব সুন্দর লাগে, কখনো মোটামুটি লাগে। এই তরুণীকে আমি যতবার দেখেছি ততবারই মুগ্ধ হয়েছি। অ্যাপ্রন ফেলে দিয়ে ফারজানা যদি ঝলমলে একটা শাড়ি পরত তা হলে কী হতো? ঠোঁটে গাঢ় লিপস্টিক, কপালে টিপ । হালকা নীল একটা শাড়ি- কানে ঝুলবে নীল পাথরের ছোট্ট দুল। এই মেয়ে কি বিয়েবাড়িতে সেজেগুজে যায় না? তখন চারদিকে অবস্থাটা কী হয়? বিয়ের কনে নিশ্চয়ই মন-খারাপ করে ভাবে- এই মেয়েটা কেন এসেছে। আজকের দিনে আমাকে সবচে সুন্দর দেখানের কথা। এই মেয়েটা সেই জায়গা নিয়ে নিয়েছে। এটা সে পারে না।

‘হিমু সাহেব!’

‘জি?’

‘বসুন।'

• • •

আমি বসলাম । আমার সামনে পিরিচে-ঢাকা একটা চায়ের কাপ । ফারজানার সামনেও তা-ই। চা তৈরি করে সে আমাকে নিয়ে এসেছে। আমি তার ভেতরে সামান্য হলেও কৌতুহল জাগিয়ে তুলতে পেরেছি।

'হিমু সাহেব!'

'জি?'

'আপনি কি সিগারেট খান?'

'কেউ দিলে খাই।'

'নিন, সিগারেট নিন। ডাক্তাররা সব রোগীকে প্রথম যে-উপদেশ দেয় তা হচ্ছে সিগারেট ছাড়ুন। সেখানে আমি আপনাকে সিগারেট দিচ্ছি- কারণ কী বলুন তো?'

'বুঝতে পারছি না।'

'কারণ, আমি নিজে একটা সিগারেট খাব। ছেলেদের সঙ্গে পাল্লা দিতে গিয়ে সিগারেট ধরেছিলাম। ছেলেরা সিগারেট খাবে, আমরা মেয়েরা কেন খাব না? এখন এমন অভ্যাস হয়েছে এর থেকে বেরুতে পারছি না। চেষ্টাও অবিশ্যি করছি না।'

ফারজানা সিগারেট ধরাল। আশ্চর্য- সিগারেটটাও তার ঠোঁটে মানিয়ে গেল! পাতলা ঠোঁটের কাছে জ্বলন্ত আগুন। বাহ, কী সুন্দর! সুন্দরী তরুণীদের ঘিরে যা থাকে সবই কি সুন্দর হয়ে যায়।'

'হিমু সাহেব!'

'জি?'

'এখন গল্প করুন। আপনার গল্প শুনি।'

'কী গল্প শুনতে চান?'

'আপনি অস্বাভাবিক একটা দৃশ্য দেখে ভয় পেয়েছিলেন। ভয় পেয়ে অসুখ বাধিয়েছেন। সেই অস্বাভাবক দৃশ্যটা কী আমি জানতে চাচ্ছি।'

'কেন জানতে চাচ্ছেন?'

• • •

‘জানতে চাচ্ছি- কারন এই পৃথিবীতে অস্বাভাবিক কিছুই ঘটে না। পৃথিবী চলে তাঁর স্বাভাবিক নিয়মে। মানুষ সেইসব নিয়ম একে একে জানতে শুরু করেছে- এই সময় আপনি যদি অস্বাভাবিক দৃশ্য দেখতে শুরু করেন তা হলে তো সমস্যা?’

‘মানুষ কি সবকিছু জেনে ফেলেছে?’

ফারজানা সিগারেটে লম্বা টান দিয়ে বলল, সবকিছু না জানলেও অনেককিছুই জেনেছে। ইউনিভার্স কীভাবে সৃষ্টি হলো তাও জেনে গেছে।

আমি চায়ে চুমুক দিতে দিতে হাসিমুখে বললাম, ইউনিভার্স কীভাবে সৃষ্টি হয়েছে?

‘বিগ ব্যাং থেকে সবকিছুর শুরু। আদিতে ছিল প্রিমরডিয়েল অ্যাটম যার দৈর্ঘ্য, প্রস্থ, উচ্চতা কিছুই নেই। সেই অ্যাটম বিগ ব্যাং-এ ভেঙে গেল-তৈরি হলো স্পেস এবং টাইম । সেই স্পেস ছড়িয়ে পড়তে লাগল। এক্সপানডিং ইউনিভার্সে।’

‘সময়ের শুরু তা হলে বিগ ব্যাং থেকে?’

‘হ্যাঁ।’

‘বিগ ব্যাং-এর আগে সময় ছিল না?’

‘না।’

‘বিগ ব্যাং-এর আগে তা হলে কী ছিল?’

‘সেটা মানুষ কখনো জানতে পারবে না। মানুষের সমস্ত বিদ্যা এবং জ্ঞানের শুরুও বিগ ব্যাং-এর পর থেকেই।’

‘তা হলে তো বলা যেতে পারে- জ্ঞানের একটা বড় অংশই মানুষের আড়ালে রেখে দেয়া হয়েছে।’

‘আপনি কি আমার সঙ্গে তর্ক করতে চাচ্ছেন?’

‘না, সুন্দরী মেয়েদের সঙ্গে আমি তর্ক করি না। তারা যা বলে তা-ই হাসিমুখে মেনে নিই।’

সস্তা ধরনের কনভারসেশন আমার সঙ্গে দয়া করে করবেন না। “সুন্দরী মেয়েদের সঙ্গে আমি তর্ক করি না” এটা বহু পুরাতন ডায়ালগ । বহুবার ব্যবহার করা হয়েছে।

• • •

শুনলেই গা-জ্বালা করে। আপনি খুব অল্প কথায় আমাকে বলুন- কী দেখে ভয় পেয়েছিলেন, তারপর রিলিজ-অর্ডার নিয়ে বাসায় চলে যান।'

'আমি আপনাকে বলব না।'

ফারজানার দৃষ্টি তীক্ষ্ণ হলো। তার ঠোঁটের সিগারেট নিভে গিয়েছিল- সে আরেকটা সিগারেট ধরাতে ধরাতে বলল, কেন বলবেন না?

আমি শান্তগলায় বললাম, আপনাকে আমি বলে ব্যাপারটা বোঝাতে পারব না। আপনাকে দৃশ্যটা দেখাতে হবে। ঘটনাটা কী পরিমাণে অস্বাভাবিক তা জানার জন্যে আপনাকে নিজের চোখে দেখতে হবে। আমি বরং আপনাকে দেখাবার ব্যবস্থা করি।

'আপনি আমাকে ভূত দেখাবেন?'

'ভূত কি না তা তো জানি না- যে-জিনিসটা দেখে ভয় পেয়েছিলাম সেটা দেখাব।'

'কবে?'

'কবে তা বলতে পারছি না। কোনো-একদিন এসে আপনাকে নিয়ে যা।'

ফারজানা সিগারেটে লম্বা টান দিয়ে বলল, আচ্ছ বেশ নিয়ে যাবেন। আমি অপেক্ষা করে থাকব ।

@@

আমি গলিটার মুখে দাঁড়িয়ে আছি।

ঢাকা শহরের অন্যসব গলির মতোই একটা গলি । একপাশে নোংরা নর্দমা । নর্দমায় গলা পিচের মতো ঘন-কালো ময়লা পানি । গলিতে ডাস্টবিন বসানো হয় না

বলে দুপাশের বাড়ির ময়লা গলিতেই ফেলা হয়। সেই ময়লার বেশিরভাগ লোকের পায়ে পায়ে চলে যায়। আর বাকিটা জমে থেকে থেকে একসময় গলিরই অংশ হয়ে যায়।

চারটা কুকুর থাকার কথা- এদের দেখলাম না। সেই জায়গায় ছোট ছোট কিছু বাচ্চাকে দেখলাম টেনিস-বল দিয়ে ক্রিকেট খেলছে। খেলা আপাতত বন্ধ, কারণ বল নর্দমায় ডুবে গেছে। কাঠি দিয়ে বল খোঁজা হচ্ছে। ঘন ময়লা পানির নর্দমায় টেনিসবলের ডুবে যাবার কথা না- আর্কিমিডিসের সূত্র অনুযায়ী ভেসে থাকার কথা। ডুবে গেল কেন কে জানে!

আমি গলির শেষ মাথা পর্যন্ত যাব কি যাব না ঠিক করতে পারছি না। এখন এই দিনের আলোয় শেষ মাথা পর্যন্ত যাওয়া না-যাওয়া অর্থহীন— মধ্যরাতের পরেই কোনো একসময় আসতে হবে। আজ বরং কিছুক্ষণ বাচ্চাদের ক্রিকেট খেলা দেখে ফিরে আসা যাক । সাতদিন হাসপাতালে শুয়ে থেকে শরীর অন্যরকম হয়ে গেছ । শরীর ঠিক করতে হবে। হিমু-টাইপ জীবনচর্চা শুরু করা দরকার।

বাচ্চারা বল খুঁজে পেয়েছে। নর্দমা থেকে বল তুলতে গিয়ে ছ'টা বাচ্চা নোংরায় মাখামাখি হয়েছে। তাতে তাদের কোনো বিকার নেই। বল খুঁজে পাওয়ার আনন্দেই তারা অভিভূত। তারা তাদের খেলা শুরু করল।

আমি শুরু করলাম আমার খেলা— ঢাকা শহরের রাস্তায়-রাস্তায় হাঁটা। গত সাতদিন এদের কাউকে দেখিনি। রাস্তাগুলির জন্যে আমার মন কেমন করছে। রাস্তাদেরও হয়তো আমার জন্যে মন কেমন করছে। কথা বলার ক্ষমতা থাকলে ওরা নিশ্চয়ই আমাকে দেখে আনন্দিত গলায় জীবনানন্দের মতো বলত- হিমু সাহেব, এত দিন কোথায় ছিলেন?

সন্ধ্যার দিকে আমি কাকরাইলের কাছাকাছি চলে এলাম। আমার পদযাত্রা কিছুক্ষণের জন্যে স্থগিত হলো- কারণ আমার পায়ের কাছে একটা মানিব্যাগ। পেট ফুলে মোটা হয়ে আছে। আমার কাছে মনে হলো মানিব্যাগটা চিৎকার করে বলছে- এই

• • •

গাধা, চুপ করে দাঁড়িয়ে আছস কেন? আমাকে তুলে পকেটে লুকিয়ে ফ্যাল। কেউ দেখছে না।

কালো পিচের রাস্তায় কালো রঙের মানিব্যাগ, চট করে চোখে পড়ে না। তা ছাড়া অন্ধকার হয়ে এসেছে। অন্ধকারে লোকজন মাটির দিকে তাকিয়ে হাঁটে না, সোজাসুজি তাকিয়ে হাঁটে । এইজন্যেই কি কারও চোখে পড়েনি? তার পরেও পেটমোটা একটা মানিব্যাগ রাস্তায় পড়ে থাকবে আর তা কারও চোখে পড়বে না এটা ঠিক বিশ্বাসযোগ্য না। আমি সাতদিন রাস্তায় ছিলাম না । এই বাংলাদেশের রাজপথগুলিতে কি অবিশ্বাস্য কাণ্ডকারখানা ঘটতে শুরু করেছে?

আমি হাত বাড়িয়ে মানিব্যাগ তুললাম। অতিরিক্ত পেটমোটা মানিব্যাগে সাধারণত মালপানি থাকে না, কাগজপত্রে ঠাসা থাকে। এখানেও হয়তো তা-ই। তুলে ঠক খাব। আমার আগে অনেকেই এই ব্যাগ তুলে ঠক খেয়ে আবার ফেলে দিয়েছে। এমনও হতে পারে সে ঘাপটি মেরে দূরে দাঁড়িয়ে আছে মজা দেখার জন্যে।

ব্যাগ খুললাম। গুপ্তধন পাওয়ার মতো আনন্দ হলো। ব্যাগভরতি টাকা রাবারের রিবন দিয়ে বাধা পাঁচশো টাকার নোটের স্তূপ। ত্রিশ-পয়ত্রিশ হাজার তো হবেই, বেশিও হতে পারে। ব্যাগটা বট করে পাঞ্জাবির পকেটে লুকিয়ে ফেলতে যাব তখন মনে হলো আমার পাঞ্জাবির পকেট নেই। আমি হচ্ছি হিমু। হিমুদের পাঞ্জাবির পকেট থাকে না। হিমুরা অন্যের মানিব্যাগ এমন ঝট করে লুকিয়েও ফেলতে চায় না। এখন কী করব? ব্যাগটা যেখানে ছিল সেখানে ফেলে রাখব? অসম্ভব! রাস্তায় পড়ে-থাকা দশ টাকার একটা নোট ফেলে রেখে চলে যাওয়া যায়, কিন্তু পাঁচশো টাকার নোট ফেলে রেখে চলে যাওয়া যায় না। নোটটা চুম্বক হয়ে মানব সন্তানদের আকর্ষণ করতে থাকে। অতি বড় যে সাধু তার ভেতরেও লুকিয়ে থাকে একটা ছিঁচকে চোর।

‘ব্রাদার, আপনার হাতে এটা কি মানিব্যাগ?’

আমি পাশ ফিরলাম। ছুঁচালো চেহারার এক যুবক দাঁড়িয়ে আছে। ঘুম থেকে উঠে হাতমুখ না ধুলে চেহারায় যেমন অসুস্থ ভাব লেগে থাকে তার মুখে সেই অসুস্থ ভাব।

চোখ হলুদ। ঠোঁট কালচে মেরে আছে। নিচের ঠোঁট খানিকটা ঝুলে গেছে। ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে দাঁত দেখা যায়। তবে কাপড়চোপড় বেশ পরিপাটি। শুধু জুতাজোড়া ময়লা। অনেকদিন কালি করা হয়নি, রঙ চটে গেছে। একটু দূরে আরও একজন। তার চেহারাও ছুঁচালো। তার মুখেও অসুস্থ ভাব এবং চোখ হলুদ। কোনো ডাক্তার দেখলে দুজনকেই বিলিরুবিন টেষ্ট করাতে পাঠাত। আমি এই জাতীয় যুবকদের চিনি। সামান্য চুরি থেকে শুরু করে মানুষের পেটে দশ ইঞ্চি ছুরি ঢুকিয়ে মোচড় দেয়ার মতো অপরাধ এরা খুব স্বাভাবিক ভঙ্গিতে করতে পারে। এরা কখনো একা চলাফেরা করে না। আবার এদের দল বড়ও হয় না। দুজনের ছোট ছোট দল। দুজনের একজন (সাধারণত দুবলা পাতলাজন) ওস্তাদ, তিনি হুকুম দেন। অন্যজন সেই হুকুম পালন করে।

এই দলটার যিনি ওস্তাদ তিনি আবার কথা বললেন, কী ব্রাদার, কথা বলছেন না কেন? হাতে কি মানিব্যাগ?

আমি হাই তোলার মতো ভঙ্গি করে বললাম, তা-ই তো মনে হয়।

‘কুড়িয়ে পেয়েছেন?’

‘কুড়িয়ে পাব কীভাবে? মানিব্যাগ তো আর ফুল না যে পড়ে থাকবে আর কুড়িয়ে নেব!’

‘পেয়েছেন কোথায়?’

‘ছিনতাই করেছি।’

দ্বিতীয় ছুঁচালো যুবক এবার হালকা চালে এগিয়ে আসছে। এ বেশ বলশালী হলেও হাঁটছে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে। তার মুখভরতি পান। সে ঠিক আমার পাশে এসে দাঁড়াল। আমার পায়ের কাছে পানের পিক ফেলে অবহেলার ভঙ্গিতে বলল, কী হইছে? প্রশ্নটা সে আমাকেই করল। তার পরেও আমি বিস্মিত হবার মতো করে বললাম, আমাকে বলছেন?

‘জে আপনারে, প্রবলেমটা কী?’

• • •

‘কোনো প্রবলেম নেই। আমার হাতে একটা মানিব্যাগ আছে, এটাই প্রবলেম। মানিব্যাগভরতি পাঁচশো টাকার নোট। ত্রিশ-পয়ত্রিশ হাজার টাকা হবার কথা। দেখবেন? এই যে নিন দেখুন।’

তারা মুখ-চাওয়াচাউয়ি করল । দেখতে চাইল না। তার পরেও আমি ব্যাগ খুলে ভেতরটা দেখিয়ে দিলাম। তারা আবারও মুখ-চাওয়াচাউয়ি করল। আমার ব্যবহারে তারা মনে হলো খানিকটা বিভ্রান্তিতে পড়ে গেছে। আমি মিষ্টি করে হাসলাম । তাদের বিভ্রান্তি আরও বাড়িয়ে দিয়ে মধুর গলায় বললাম, মানিব্যাগ নিতে চান?

কাক মানুষের হাত থেকে খাবার নিয়ে উড়ে যায়। কিন্তু তাদেরকে যদি যত্ন করে থালায় খাবার বেড়ে ডাকা হয় আয় আয় তখন তারা আর কাছে আসে না। দূর থেকে ঘাড় ঘুরিয়ে তাকিয়ে থাকে। উড়ে চলেও যায় না, আবার কাছেও আসে না। যুবক দুটির মধ্যে কাকভাব প্রবল বলে মনে হলো । তারা সরুচোখে মানিব্যাগের দিকে তাকিয়ে আছে । হাত বাড়াচ্ছে না। আমাকে ছেড়ে চলেও যাচ্ছে না। আমি আবারও বললাম, কী, মানিব্যাগ নিতে চান? নিতে চাইলে নেন।

পানমুখের যুবক আবারও পিক ফেলল। সে একটু চিন্তিতমুখে তার ওস্তাদের দিকে তাকাচ্ছে । ওস্তাদের নির্দেশের অপেক্ষা । ওস্তাদ নির্দেশ দিচ্ছেন না। সময় নিচ্ছেন।

পরিস্থিতি তিনি যত সহজ ভেবেছিলেন এখন তত সহজ মনে হচ্ছে না। চট করে ডিসিশান নেয়া যাচ্ছে না।

জায়গাটা নির্জন নয়। ঢাকা শহরে নির্জন জায়গা নেই। তবে আমি যেখানে দাঁড়িয়ে সে-জায়গাটায় এই মুহুর্তে লোক-চলাচল নেই। ওস্তাদ এবং শাগরেদ আমার দুপাশে দাঁড়িয়ে আছে। ওস্তাদের বা হাত প্যান্টের পকেটে। লোকটি সম্ভবত বায়া। এবং সে তার বা হাতে ক্ষুর ধরে আছে। যে-কোনো মুহুর্তে ক্ষুর বের করবে। সেই মুহুর্তের জন্যে অপেক্ষা ।

আমি হঠাৎ করেই লম্বা লম্বা পা ফেলে হাঁটা শুরু করলাম। তারা একটু হকচকিয়ে গেল, তবে তৎক্ষণাৎ আমার পেছনে পেছনে আসতে শুরু করল । ওস্তাদ বিশেষ ভঙ্গিতে

• • •

কাশলেন, সঙ্গে সঙ্গে শাগরেদ প্রায় দৌড়ে আমার সামনে চলে এল। এখন আমরা তিনজন হাঁটছি। শাগরেদ সবার আগে, মাঝখানে আমি এবং পেছনে ওস্তাদ । ওরা আমার হাত থেকে মানিব্যাগটা নিয়ে দৌড় দিচ্ছে না কেন বুঝতে পারছি না। সবচে সহজ এবং যুক্তিযুক্ত কাজ হলো মানিব্যাগ নিয়ে দৌড় দেয়া। অবিশ্যি এদের নানানরকম টেকনিক আছে। এরা কোন টেকনিক ফলো করছে কে জানে!

কাকরাইলের আশেপাশের রাস্তার একটা নিয়ম হলো কথা নেই বার্তা নেই হঠাৎ একদল তবলিগ জামাতি কোত্থেকে যেন উদয় হয়। এখানেও তা-ই হলো । দশ-এগারো জনের একটা দল পোটলা-পুটলি, বদনা, ছাতা নিয়ে উপস্থিত। হাসিখুশি কাফেলা। তারা চলছে আমাদের সঙ্গে সঙ্গে। আমি মাথা ঘুরিয়ে আমার পেছনের ওস্তাদের দিকে তাকালাম। বেচারার মুখ হতাশায় গেছে। নিচের ঠোঁট আরও নেমে গেছে। ভালো একটা শিকার পেয়েছিল । সেই শিকার হাসিমুখে তবলিগ জামাতিদের দলে ভিড়ে গেছে ।

তবলিগের দল কাকরাইল মসজিদের দিকে চলে গেল। আমি ইচ্ছা করলে ওদের সঙ্গে ভিড়ে যেতে পারতাম। তা করলাম না। আমি রওনা হলাম চায়ের দোকানের দিকে। ওস্তাদ এবং শাগরেদের মধ্যে নতুন উৎসাহ দেখা দিল। তারা চোখে-চোখে কিছু কথা বলল। দুজনই একসঙ্গে সিগারেট ধরাল। তারাও আসছে। আসুক। চা-টা একসঙ্গে খাই। হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেয়েই মজাদার নাটকের ভেতর ঢুকে গেছি। ভালো লাগছে। নাটকের শেষটা রক্তারক্তি পর্যন্ত না গড়ালেই হয়।

চায়ের দোকানের মালিকের নাম কাওছার মিয়া। এক মধ্যরাতে তার সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছিল । কাওছার মিয়ার ধারণা সেই রাতে আমি তাকে ভয়ংকর বিপদ থেকে উদ্ধার করেছিলাম। মধ্যরাতের পরিচিতজনরা সাধরণত সন্ধ্যারাতে কেউ কাউকে চেনে না। কাওছার মিয়া চিনল । "আরে হিমু ভাইয়া, আফনে!" এই বলে যে-চিৎকার দিল তাতে নামাজ ভঙ্গ করে কাকরাইল মসজিদের মুসুল্লিদের ছুটে আসার কথা। তারা ছুটে এলেন না, তবে ওস্তাদ ও শাগরেদের আক্কেলগুড়ুম হয়ে গেল। কাওছার মিয়া চায়ের দোকানের মালিক হলেও তাকে দেখাচ্ছে ভীমভবানীর মতো । সে আদর করে কারও

পিঠে থাবা দিলে সেই মানবসন্তানের মেরুদণ্ডের বেশকিছু হাড় খুলে পড়ে যাবার কথা।

কাওছার মিয়া চিৎকার দিয়েই থামল না, দোকান ফেলে ছুটে এসে পায়ে পড়ে গেল। যেন অনেকদিন পর শিষ্য তার গুরুর দেখা পেয়েছে। চরণধুলি না নেয়া পর্যন্ত শিষ্য-গুরুর সাক্ষাৎ সম্পূর্ণ হবে না।

'আফনেরে যে আবার দেখমু ভাবি নাই। আল্লাহপাকের খাস রহমতে আফনেরে পাইছি। আছেন কেমুন হিমু ভাই।'

'ভালো ।'

'আফনে একটা বড়ই আচায্য মানুষ। অখন কন কেমনে আফনের খেদমত করি।'

'চা খাওয়াও । পয়সা কিন্তু দিতে পারব না।'

কাওছার হতভম্ব গলায় বলল, পয়সার কথা তুললেন এর থাইক্যা জুতা দিয়া দুই গালে দুইটা বাড়ি দিতেন।

আমি ওস্তাদ ও শাগরেদকে দেখিয়ে বললাম, আমার দুজন গেস্ট আছে। এদেরও চা দাও।

কাওছার মিয়া তার সবকটা দাঁত বের করে বলল, আর কী খাইবেন কন ।

'আর কিছু লাগবে না।'

'ছিরগেট? ছিরগেট আইন্যা দেই?'

'দাও।'

কাওছার মিয়া দোকানের ছেলেটাকে পান-সিগারেট আনতে পাঠাল । তিনশলা বেনসন। তিনটা মিষ্টি পান, জর্দা 'আলিদা'।

ওস্তাদ ও শাগরেদ পুরোপুরি থমকে গেল । তবে চলে গেল না। দাঁড়িয়ে রইল। এখন তাদের চোখ আমার হাতে-ধরা মানিব্যাগের দিকে । আমি চায়ের কাপ তাদের দিকে বাড়িয়ে বললাম, ভাই, চা খান অনেকক্ষণ আমার পিছনে পিছনে ঘুরছেন, নিশ্চয়ই টায়ার্ড।

• • •

ওস্তাদ বললেন, চা খাব না।

শাগরেদও সঙ্গে সঙ্গে বলল, চা খাব না।

কাওছার মিয়া চোখ কপালে তুলে বলল, হিমু ভাইয়া চা সাধতেছে, আর চা খাইবেন না! কন কী আফনে? আচায্য ঘটনা! ধরেন, চা নেন।

ওস্তাদ ও শাগরেদ দুজনেই শুকনোমুখে চায়ের কাপ তুলল। কাওছার মিয়া তার বেনসন সিগারেট এগিয়ে দিতে দিতে বলল, আফনাদের পরিচয়?

ওস্তাদ ও শাগরেদ মুখ-চাওয়াচাউয়ি করছে। আমি তাদের পরিচয়দান থেকে রক্ষা করলাম। কাওছারকে বললাম, শোনো কাওছার মিয়া। আমি একটা মানিব্যাগ কুড়িয়ে পেয়েছি। মানিব্যাগে টাকার পরিমাণ ভালোই, ত্রিশ-পয়ত্রিশ হাজার তো বটেই। টাকাটা দিয়ে কী করা যায় বলো তো!

কাওছারের মুখ হাঁ হয়ে গেল। সে বিড়বিড় করে বলল, খাইছে রে! আমি ওস্তাদ ও শাগরেদের দিকে তাকালাম । তারা মনে হচ্ছে দুঃখে কেঁদে ফেলবে। আমি তাদের দিকে মানিব্যাগটা এগিয়ে দিয়ে বললাম, ভালো করে দেখুন তো কোনো ঠিকানা-লেখা কাগজ আছে কি না। আর টাকাটাও গুনে দেখুন। ঠিকানা পাওয়া গেলে চলুন দিয়ে আসি । এতগুলি টাকা একা একা নিয়ে যাওয়া ঠিক না। আমার নাম হিমু, আপনাদের পরিচয়টা কী?

ওস্তাদ বিড়বিড় করে বললেন, আমার নাম মোফাজ্জল। আর এ জহিরুল ।

‘ঠিকানা পাওয়া গেছে?’

‘টুকরা কাগজ অনেক আছে- কোনটা ঠিকানা কে জানে!’

‘ঐ দেখে দেখে বের করে ফেলব। আপনাদের কাজ না থাকলে চলুন আমার সঙ্গে । কাজ আছে?’

‘না।’

‘তা হলে মানিব্যাগটা আপনার পকেটে রাখুন। আমার পাঞ্জাবির পকেট নেই। আপনাদের পাওয়ায় আমার সুবিধাই হলো।’

• • •

মোফাজ্জল আমার দিকে তাকিয়ে বিচিত্র ভঙ্গিতে হাসল। আমি তার দিকে কঠিন চোখে তাকিয়ে তার চেয়েও বিচিত্র ভঙ্গিতে হাসলাম। বিচিত্র হাসি, বিচিত্র হাসিতে কাটাকাটি ।

কাওছার উৎসাহের সঙ্গে বলল, টেকাটা আগে গনেন। কত টেকা?

জহিরুল টাকা গুনছে। বেশ আগ্রহের সঙ্গেই গুনছে। কাওছার বলল, আরেক দফা চা দিমু হিমু ভাই?

'দাও।'

'মোফাজ্জল ভাই, জহিরুল ভাই আফনেরারে দিমু?'

জহিরুল টাকা গোনায় ব্যস্ত। সে কিছু বলল না। মোফাজ্জল উদাস গলায় বলল, দাও।

আমরা রাত দুটার দিকে ঝিকাতলার এক টিনের বাড়ির দরজায় প্রবল উৎসাহে কড়া নাড়তে লাগলাম। আমরা কড়া নাড়ছি বলা ঠিক হচ্ছে না। আমি কড়া নাড়ছি, বাকি দুজন চিমশামুখে দাঁড়িয়ে আছে। এরা আমাকে ছেড়ে চলেও যাচ্ছে না, আবার সঙ্গে থাকার কোনো কারণও বোধহয় খুঁজে পাচ্ছে না। বেশ কিছুক্ষণ কড়া নাড়ার পর এক ভদ্রলোক বের হয়ে এলেন। পঞ্চাশ-ষাট হবে বয়স। মাথার চুল ধবধবে শাদা। ভদ্রলোক মনে হয় অসুস্থ। কেমন উদভ্রান্ত দৃষ্টি। আমাদের দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে আছেন, কিন্তু চোখের পলক ফেলছেন না। আমি বললাম, আপনার কি কোনো মানিব্যাগ হারিয়েছে?

ভদ্রলোক কিছু বললেন না, শূন্যদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন। আমি বললাম, মানিব্যাগে অনেকগুলি টাকা ছিল। আমার ধারণা আপনারই মানিব্যাগ ।

ভদ্রলোক বাড়ির ভিতরের দিকে তাকিয়ে অদ্ভুত গলায় ডাকলেন, মীরা! মীরা!

মীরা বের হয়ে এল। আমি হিমু না হয়ে অন্য কেউ হলে তৎক্ষণাৎ মেয়েটির প্রেমে পড়ে যেতাম কী মিষ্টি যে তার মুখ! মনে হচ্ছে এইমাত্র সে গোসল করে চোখে কাজল দিয়ে এসেছে। সব রূপবতী মেয়ের চোখ বিষণ্ন হয়। এই মেয়ের চোখও বিষণ্ন ।

• • •

ভদ্রলোক বললেন, মা, তোকে আমি বলেছিলাম না টাকাটা পাওয়া যাবে? এখন বিশ্বাস হলো?

মীরা তাকাল আমার দিকে। আমি বললাম, ভালো আছেন?

মীরা ভুরু কুঁচকে ফেলল। আমি মোফাজ্জলের দিকে তাকিয়ে বললাম, মানিব্যাগ দিয়ে দিন। মোফাজ্জল কঠিন গলায় বলল, মানিব্যাগ যে উনাদের তার প্রমাণ কী?

আমি উদাস গলায় বললাম, প্রমাণ লাগবে না। মীরা,তুমি টাকাটা গুনে নাও ।

মীরার কোঁচকানো ভুরু আরও কুঁচকে গেল। আমার মতো অভাজন তাকে তুমি করে বলবে তা সে মেনে নিতে পারছে না। মানিব্যাগ-সংক্রান্ত জটিলতা না থাকলে সে নিশ্চয়ই শুকনো গলায় বলত, আমাকে তুমি করে না বললে খুশি হবো ।

মোফাজ্জল অপ্রসন্ন মুখে পকেট থেকে মানিব্যাগ বের করল। এরকম অপ্রীতিকর কাজ সে মনে হয় তার জীবনে আর করেনি। মোফাজ্জলের চেয়েও বেশি মন-খারাপ হয়েছে তার টেগুল জহিরুলের। জহিরুল মনে হয় মনের দুঃখে কেঁদেই ফেলবে।

ভদ্রলোক আবারও মীরাকে বললেন, বলেছিলাম না সব টাকা ফেরত পাব, বিশ্বাস হলো? তুই তো কেঁদে অস্থির হলি । নে, টাকাটা গুনে দ্যাখ। সাঁইত্রিশ হাজার নয়শো একুশ টাকা আছে।

মীরা বলল, গুনতে হবে না।

ভদ্রলোক বললেন, আহা, গুনে দ্যাখ-না!

আমি বললাম, মীরা, তুমি সাবধানে গুনতে থাকো। আমরা চললাম।

শুরুতেই তুমি বলয় মেয়েটা রেগে গেছে তাকে আবারও তুমি বলে আরও রাগিয়ে দিয়ে বের হয়ে এলাম।

মোফাজ্জল ক্রুদ্ধ গলায় বলল, এতগুলো টাকা ফেরত পেয়েছে তার কোনো আলামত নাই । শালার দুনিয়া! লাথি মারি এমন দুনিয়ারে!

জহিরুল বলল, এক হাজার টাকা বখশিশ দিলেও তো একটা কথা ছিল কী বলেন ওস্তাদ । বখশিশ না দেওয়াটা অধর্ম হয়েছে।

• • •

আমি বললাম, বখশিশ পেলে কী করতেন?

জহিরুল দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বলল, কী আর করতাম-মাল খাইতাম । গত চাইরদিনে তিন আঙ্গুল পরিমাণ বাংলা খাইছি। তিন আঙ্গুল বাংলায় কী হয় কন। তিন আঙ্গুল মাল ইচ্ছা করলে একটা মশাও খাইতে পারে। মাল খাওয়া তো দূরের কথা, আজ সারাদিনে ভাতও খাই নাই। আপনার পিছে পিছে বেফিকির হাঁটতেছি । আইজ যত হাঁটা হাঁটছি একটা ফকিরও অত হাঁটা হাঁটে না ।

মোফাজ্জল বিরক্তমুখে বলল, চুপ কর। এত কথার দরকার কী। হিমু ভাইয়া বিদায় দেন, আমরা এখন যাই ।

'যাবেন কোথায়?'

'জানি না কই যাব।'

'আমার সঙ্গে চলেন, মাল খাওয়াব।'

মোফাজ্জল সরু চোখে তাকিয়ে রইল। সে আমার কথা বিশ্বাস করতে পারছে না, আবার অবিশ্বাসও করতে পারছে না। বিশ্বাস ও অবিশ্বাসের মাঝামাঝি বাস করা খুবই কষ্টকর। মোফাজ্জল আছে সেই কষ্টে ।

'কী, যাবেন?'

'সত্যি মাল খাওয়াবেন?'

'হু।'

'কী খাওয়াবেন- বাংলা?'

'বাংলা ইংরেজি জানি না, তবে খাওয়াব।'

'চলেন যাই ।'

মোফাজ্জল অনিচ্ছার সঙ্গে হাঁটছে। তবে জহিরুলের চোখ চকচক করছে। কিছু মানুষ আছে যাদের জন্মই হয় শিষ্য হবার জন্যে। জহিরুল হলো সেই মানুষ এরা কখনো বিশ্বাস-অবিশ্বাসের মাঝামাঝি বাস করে না। এরা বাস করে বিশ্বাসের জগতে । যে যা বলে তা-ই বিশ্বাস করে।

• • •

জহিরুল বলল, হিমু ভাই, আপনেরে আমার পছন্দ হয়েছে।

'কেন?'

'জানি না কেন ।'

'মাল খাওয়াতে নিয়ে যাচ্ছি এইজন্যে?'

'হইতে পারে। আপনের পকেটে সিগারেট আছে হিমু ভাই? একটা সিগারেট দেন ধরাই ।'

'আমার পাঞ্জাবির পকেটই নেই, আবার সিগারেট!'

'সত্যই আপনের পাঞ্জাবির পকেট নাই!'

পাঞ্জাবির পকেট যে নেই তা আমি দেখালাম। মোফাজ্জ্বল বলল, টাকাপয়সা কই রাখেন? পায়জামার সিক্রেট পকেটে?

আমি হাসিমুখে বললাম, আমার কোনো সিক্রেট পকেট নেই। আমি সঙ্গে কখনো টাকাপয়সা রাখি না ।

মোফাজ্জল আবারও বিশ্বাস-অবিশ্বাসের মাঝামাঝি জগতে চলে গেল। আগের অবস্থা, আমার কথা বিশ্বাসও করতে পারছে না, আবার অবিশ্বাসও করতে পারছে না । সে দারুণ অস্বস্তির মধ্যে পড়েছে। তবে জহিরুল আমার কথা বিশ্বাস করেছে।

আমি তাদের নিয়ে বাদলদের বাড়িতে উপস্থিত হলাম। এত রাতে কারোরই জেগে থাকার কথা না, কিন্তু আমি জানি তারা সবাই জেগে আছে।

আমার মন বলছে- প্রবলভাবেই বলছে। কিছু-কিছু সময় আমার ইনটিউশন খুব কাজ করে।

আমি বড় ফুপার কাছে প্রতিজ্ঞা করেছি বাদলের ত্রিসীমানায় থাকব না। নির্বিঘ্নে বাদলের বিয়ে হয়ে যাবে। এখন প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করে রাত আড়াইটায় দুই উটকো লোক নিয়ে উপস্থিত হলে ঘটনা কী ঘটবে কে জানে! বড় ফুপা ব্যাপারটা খুব সহজভাবে নেবেন বলে মনে হয় না। তবে সম্ভাবনা শতকরা ৯০ ভাগ যে তিনি ইতিমধ্যে বোতল নিয়ে ছাদে চলে গেছেন। কারণ আজ বৃহস্পতিবার। ফুপার মদ্যপান-দিবস। বোতল

নিয়ে বসার জন্যে সুন্দর অজুহাতও আছে- ছেলের বিয়ের কথাবার্তা হচ্ছে। এই তো সেদিন ছোট্ট একটা ছেলে ছিল, শীতের দিনে বিছানায় পিপি করে কাঁদো-কাঁদো গলায় বলত, মা, কে যেন পানি ফেলে দিয়েছে। সে আজ বিয়ে করে বউ আনতে যাচ্ছে। এ তো শুধু আনন্দের ঘটনা না, মহা আনন্দের ঘটনা। সেই আনন্দটাকে একটু বাড়িয়ে দেবার জন্যে সামান্য কয়েক ফোটা দিয়ে গলা ভেজানো।

বড় ফুপা দ্রবীভূত অবস্থায় থাকলে কোনো সমস্যা হবে না। মোফাজ্জল এবং জহিরুল এরাও ভাগ পাবে। মদ্যপায়ীরা মদের ব্যাপারে খুব দরাজদিল হয়। দশটা টাকা ধার চাইলে এরা দেবে না, কিন্তু তিন হাজার টাকা দামের বোতলের পুরোটা আনন্দের সঙ্গে অন্যকে খাইয়ে দেবে।

যা ভেবেছি তা-ই ।

বাড়ির সব বাতি জ্বলছে। হাসির শব্দ শোনা যাচ্ছে। আনন্দ উছলে পড়ছে। খোলা জানালায় সেই আনন্দ উছলে বের হয়ে আসছে। হাসির শব্দ হৈচৈয়ের শব্দ, ছোট বাচ্চাদের কান্নাকাটির শব্দ। আমি কলিংবেলে হাত রাখার আগেই দরজা খুলে গেল। বড় ফুপু দরজা খুললেন। তার পরনে লাল বেনারসি, ইদানীংকার ফ্যাশানের মতো কপালে সিঁদুর। বড় ফুপু হাসিমুখে বললেন, কী রে হিমু, তুই এত দেরি করলি? তোর জন্যে বাদল এখনও না খেয়ে বসে আছে।

আমি হাসলাম । "দেরি করার অপরাধে খুবই লজ্জিত" এই টাইপের হাসি। ব্যাপারটা কী বুঝতে পারছি না। বাদলের বিয়ে হয়ে গেল নাকি? বিয়ে বোধহয় না। মনে হচ্ছে গায়ে-হলুদ। ফুপুর কপালে হলুদ লেগে আছে।

'আশ্চর্য, একটা দিন সময়মতো আসবি না, আমি কি রোজই ছেলের বিয়ে দেব? গায়ে-হলুদের এমন জমজমাট অনুষ্ঠান- আর তুই নেই! বাদল অস্থির হয়ে আছে তোর জন্যে । ঝিম মেরে আছিস, ব্যাপার কী? কথা বলছিস না কেন?'

• • •

'তোমাকে আসলে চিনতেই পারিনি। এইজন্যেই চুপ করে ছিলাম। মাই গড, তোমাকে তো দারুণ লাগছে! কে বলবে তোমার ছেলের বিয়ে! মনে হচ্ছে তোমারই বিয়ে হয়নি।'

'পাম-দেয়া কথা বলবি না তো। দরজায় দাঁড়িয়ে আছিস কেন? আয়, ভেতরে আয়।'

আমি গলা নিচু করে বললাম, ফুপু, আমার দুজন গেষ্ট আছে, ওদের নিয়ে আসব?

'ওরা কোথায়?'

'রাস্তায় দাঁড় করিয়ে রেখেছি। বাড়িতে ঢুকতে দাও কি না-দাও জানি না তো!'

'তোর কি বুদ্ধিশুদ্ধি দিনদিন চলে যাচ্ছে নাকি? আমার ছেলের বিয়েতে তুই বন্ধুবান্ধব নিয়ে আসবি না তো কি পাড়ার লোকের বিয়েতে আসবি! আর তোর আক্কেলটাই-বা কীরকম রাস্তায় দাঁড় করিয়ে রাখলি কোন হিসাবে- ওরা নাজানি কী ভাবছে!'

'কিছুই ভাবছে না, আমি নিয়ে আসছি। ফুপা কি বাসায় আছেন?'

'বাসায় থাকবে না তো যাবে কোথায়? একটা অজুহাত পেয়েছে ছেলের বিয়ে- বোতল নিয়ে ছাদে চলে গেছে। বাড়ি ভরতি লোকজন। নাজানি কী ভাবছে।'

'তোমাকে কিন্তু দারুণ লাগছে ফুপু! শাড়ি কি কোনো নতুন কায়দায় পরেছ? মোটাটা অনেকটা ঢাকা পড়েছে!'

'সত্যি বলছিস?'

'অবশ্যই সত্যি বলছি।'

'রিনাও বলছিল আমাকে নাকি স্লিম লাগছে। তুই কথা বলে সময় নষ্ট করিস না তো! তোর বন্ধুদের নিয়ে আয়, আমি খাবার গরম করছি।'

'বন্ধুরা কিছু খাবে না ফুপু, ওরা খেয়ে এসেছে। আমি বাদলের সঙ্গে খাব, ওরা ছাদে বসে ফুপার সঙ্গে গল্প করবে।'

• • •

ফুপা আমাকে দেখে আনন্দে অভিভূত হলেন। মাতালরা একটা পর্যায়ে যে-কোনো ব্যাপারে আনন্দে অভিভূত হয়। তার এখন সেই অবস্থা চলছে। ফুপার মনেই নেই যে তিনি আমাকে আসতে নিষেধ করেছেন।

'আরে হিমু! হোয়াট এ প্লেজেন্ট সারপ্রাইজ! তোর কথাই ভাবছিলাম।'

'ফুপা, এরা হলো আমার দুই বন্ধু, একজন মোফাজ্জল, আর একজন জহিরুল ।'

ফুপা মধুর গলায় বললেন, তোমরা কেমন আছ? তুমি করে বললাম, কিছু মনে কোরো না আবার! হিমু হলো আমার ছেলের মতো, সেই হিসেবে তোমরাও আমার ছেলে। হা হা হা, দাঁড়িয়ে আছ কেন, খুব ঠাণ্ডা তো, এইজন্যেই দুফোঁটা হুইস্কি খাচ্ছি। তার উপর ছেলের বিয়ে- মহা আনন্দের ব্যাপার! মেয়ের বিয়ে হলে কষ্টের ব্যাপার হতো। মেয়ের বিয়ে মানে মেয়ের বিদায়। ছেলের বিয়ে মানে নতুন একটা মেয়ে প্রাপ্তি। এই উপলক্ষে সামান্য মদ্যপান করা যায়। ঠিক না?

জহিরুল বলল, এই দিন যদি মাল না খান খাবেন কবে!

'এই ব্যাপারটাই তো তোমাদের ফুপুকে বোঝাতে পারছিলাম না। শরৎচন্দ্রের দেবদাস পড়ে মেয়েরা ধরেই নিয়েছে মদ একটা ভয়াবহ ব্যাপার। পরিমিত মদ্যপান যে হার্টের কত বড় অষুধ তা এরা জানে না। টাইম পত্রিকায় একটা আর্টিকেল ছাপা হয়েছে, সেখানে পরিষ্কার লেখা— যারা পরিমিত মদ্যপান করে তাদের হার্ট অ্যাটাকের রিস্ক অর্ধেক কমে যায়। তোমরা কি একটু খেয়ে দেখবে?'

মোফাজ্জল বলল, জি না, জি না। আপনি মুরুব্বি মানুষ।

'লজ্জা করবে না তো, খাও। এত বড় একটা আনন্দ-উৎসবে আমি একা একা বসে আছি। তোমরা আসায় তাও কথা বলার লোক পাচ্ছি। হিমু যা তো, দুটা গ্লাস এনে দে। বোতল আরেকটা লাগবে। আমার ঘরে চলে যা। বুকশেলফের তিন নম্বর তাকে বইগুলোর পেছনে একটা ব্ল্যাক ডগের বোতল আছে। এইসব জিনিস একা খেয়ে কোনো আনন্দ নেই- তাই না তফাজ্জল?'

'স্যার, আমার নাম মোফাজ্জল।'

• • •

'স্যার বলছ কেন? আমি হিমুর ফুপা, তোমারও ফুপা । এই যে শুটকা ছেলেটা তারও ফুপা । তোমার নাম যেন কী?'

'জহিরুল।'

'শুটকা ছেলে বলায় রাগ করনি তো?'

'জি না।'

'তোমার ফুপুকে দেখার পর পৃথিবীর যে-কোনো মানুষকেই আমার কাছে শুটকা মনে হয়। একবার কী হয়েছে শোনো। প্লেনে করে চিটাগাং যাচ্ছি- সে দেখি প্লেনের সিটে ঢোকে না। হাস্যকর ঘটনা। এয়ার হোস্টেস, আমি দুজনে মিলে ঠেলাঠেলি । এখনও মনে করলে লজ্জায় মরে যাই।'

আমি নিচে চলে এলাম। মোফাজ্জল আর জহিরুলকে নিয়ে আর চিন্তার কিছু নেই। তারা মনের সুখে ব্ল্যাক ডগ খেতে পারবে। ফুপা যত্ন করে মুখে তুলে তুলে খাওয়াবেন। বোতল শেষ হলেও কোনো সমস্যা নেই। বিচিত্র সব জায়গা থেকে নতুন নতুন বোতল বের হবে। শেষের দিকে সিচুয়েশন আউট অভ হ্যান্ড হয়ে যাবার সম্ভাবনাও অবিশ্যি আছে। এক মাতাল হয় বিষণ্ন প্রকৃতির, দুই মাতাল হয় মিত্রভাবাপন্ন- তিন মাতাল সর্বদাই ভয়াবহ।

খাওয়া শেষ করে আমি বাদলের ঘরে গিয়ে বসেছি। বাদলের গায়ে সিল্কের পাঞ্জাবি, হাতে রাখি। চোখেমুখে লজ্জিত একটা ভাব। বিবাহ নামক অপরাধ করতে যাচ্ছে এই কারণে সে যেন ছোট হয়ে আছে। তাকে দেখাচ্ছেও খুব সুন্দর। বিয়ের আগে-আগে শুধু যে মেয়েরেই সুন্দর হয়ে যায় তা না, ছেলেরাও সুন্দর হয়। আমি বদলের দিকে মুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে আছি।

'বাদল, তোকে খুব সুন্দর গায়ের রঙও তো মনে হয় খোলতাই হয়েছে।'

বাদল হাসিমুখে বলল, হলুদ দিয়ে ডলাডলি করে গায়ের চামড়া তুলে ফেলেছে, রঙ তো খোলতাই হবেই।

'বিয়ে হচ্ছে যার সঙ্গে সেই মেয়েটার নাম কী?'

• • •

‘পুরানা ধরনের নাম- আঁখি।’

‘মেয়েটা কেমন?’

‘জানি না কেমন । কথা হয়নি তো!’

‘খুব সুন্দর?’

‘সবাই তো তা-ই বলছে।’

‘তুই বলছিস না?’

বাদল লজ্জা-লজ্জা গলায় বলল, আমি বলছি।

‘তোর খুব ভালো একটা দিনে বিয়ে হচ্ছে। ২২ ডিসেম্বর। অদ্ভুত!’

‘২২ ডিসেম্বর কি খুব শুভদিন হিমুদা?’

‘বৎসরের সবচেয়ে লম্বা রাতটা হলো ২২ ডিসেম্বরের রাত। তোরা দুজন গল্প করার জন্যে অনেক সময় পাবি। এই কারণেই শুভ।’

বাদল লজ্জিত ভঙ্গিতে হাসল। হঠাৎ হাসি থামিয়ে বলল, আঁখির সঙ্গে কী নিয়ে কথা বলব সেটাই বুঝতে পারছি না! বোকার মতো হয়তো কিছু বলব, পরে সে এটা নিয়ে হাসাহাসি করবে।

‘করুক-না হাসাহাসি! তোর যা মনে আসে তুই বলবি । দুই-একটা কবিতা টবিতা মুখস্থ করে যা।’

‘কী কবিতা?’

‘প্রেমের কবিতা।’

‘প্রেমের তো অনেক কবিতা আছে, কোনটা মুখস্থ করব সেটা বলো।’

‘কোনটা বলব, আমার তো দুই-তিন লাইনের বেশি কোনো কবিতা মনে থাকে না।’

‘দুই-তিন লাইনই বলো। এক সেকেণ্ড দাঁড়াও- আমি কাগজ-কলম নিয়ে আসি- লিখে ফেলি।’

• • •

বাদল গম্ভীর ভঙ্গিতে বলপয়েন্ট আর কাগজ নিয়ে বসেছে। আমি কবিতা বলব, সে লিখে মুখস্থ করবে, বাসররাতে তার স্ত্রীকে শোনাবে। হাস্যকর একটা ব্যাপার, কিন্তু আমার কেন জানি হাস্যকর লাগছে না। বাদল বলল, কই, চুপ করে আছ কেন, বলো!

আমি বললাম, লিখে ফ্যাল-

এভাবে নয়, এভাবে ঠিক হয় না।
নদীর বুকে বৃষ্টি পড়ে পাহাড় তাকে সয় না।
এভাবে নয়, এভাবে ঠিক হয় না।
কেমন করে ফুলের কাছে রয়
গন্ধ আর বাতাস দুই জনে...
এভাবে হয়, এমন ভাবে হয়।

বাদল বলল, এটা কার কবিতা, তোমার?

'পাগল হয়েছিস? আমি কবিতা লিখি নাকি? এই কবিতা শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের।'

'কতদিন পর তোমাকে দেখছি, কী যে অদ্ভুত লাগছে!'

'অদ্ভুত লাগছে?'

'হু, লাগছে। আঁখির সঙ্গে বেশি গল্প হবে তোমাকে নিয়ে।'

'ওকে নিয়ে আবার খালিপায়ে হাঁটতে বের হবি না তো?'

'অবশ্যই বের হব। আমি পরব হলুদ পাঞ্জাবি, ওকে পরাব হলুদ শাড়ি। তারপর...'

'তারপর কী?'

'সেটা বলতে পারব না, লজ্জা লাগছে। হিমুদা শোনো, তোমার জন্যে আমি খুব সুন্দর একটা গিফট এনেছি। আন্দাজ করো তো কী?'

'আন্দাজ করতে পারছি না।'

'একটা খুব দামি স্লিপিংব্যাগ নিয়ে এসেছি। তুমি তো যেখানে-সেখানে রাত কাটাও- ব্যাগটা থাকলে সুবিধা- ব্যাগের ভেতর ঢুকে পড়বে। স্লিপিংব্যাগের কালার তোমার পছন্দ হবে না। মেরুন কালার। অনেক খুঁজেছি- হলুদ পাইনি।'

• • •

বাদল স্লিপিংব্যাগ নিয়ে এল। বোঝাই যাচ্ছে- অনেক টাকা দিয়ে কিনেছে।

'হিমুদা, পছন্দ হয়েছে?'

'খুব পছন্দ হয়েছে।'

'ব্যাগটা থাকায় তোমার খুব সুবিধা হবে। ধরো তুমি জঙ্গলে জোছনা দেখতে গিয়েছ। অনেক রাত পর্যন্ত জোছনা দেখলে-ঘুম পেয়ে গেলে কোনো-একটা গাছের নিচে ব্যাগ রেখে তার ভেতর ঢুকে গেলে।'

'আমারও ইচ্ছে করছে। হিমুদা চলো, কাছেপিছের কোনো-একটা জঙ্গলে চলে যাই– জয়দেবপুরের শালবনে গেলে কেমন হয়?'

'বিয়ের আগে তোর কোথাও যাওয়া ঠিক হবে না। বিয়ে হয়ে যাক, তারপর তুই আর আঁখি, হিমু ও হিমি...'

আমি বাক্যটা শেষ করার আগেই রণরঙ্গিনী মূর্তিতে ফুপু ঢুকলেন। তিনি আমার দিকে তাকিয়ে খরখরে গলায় বললেন, তুই কাদের বাসায় নিয়ে এসেছিস? বাঁদর দুটোকে জোগাড় করেছিস কোথায়?

আমি হকচকিয়ে গিয়ে বললাম, কেন, ওরা কী করেছে?

'দুটোই তো ন্যাংটো হয়ে ছাদে নাচানাচি করছে! তোর ফুপাও নাচছে।'

'বল কী!'

'তুই এক্ষুনি এই মুহূর্তে এদের নিয়ে বিদেয় হবি।'

আমি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে উঠে দাঁড়ালাম। আমার বগলে বাদলের আনা মেরুন রঙের স্লিপিংব্যাগ ।

ফুটপাতে যারা ঘুমায় দেখা যাচ্ছে তাদের কিছু নীতিমালা আছে। তারা জায়গা-বদল করে না। ঘুমুবার জায়গা সবার যে নিউ মার্কেটের পাশে ঘুমায় সে যদি সন্ধ্যাবেলায় বাসাবোতে থাকে- সেও হেঁটে হেঁটে নিউ মার্কেটের পাশে এসে নিজের জায়গায় ঘুমুবে।

কাজেই বস্তা-ভাইকে খুঁজে বের করতে আমার অসুবিধা হলো না। দেখা গেল সাত দিন আগে তারা যেখানে ঘুমুচ্ছিল এখনও সেখানেই ঘুমুচ্ছে। পিতা এবং পুত্র চটের

ভেতরে ঢুকে আরামে নিদ্রা দিচ্ছে। আমি তাদের ঘুম ভাঙালাম। বস্তা-ভাইয়ের পুত্রের বয়স খুবই কম। চার-পাঁচ বছর হবে। কাঁচা ঘুম ভাঙায় সে খুবই ভয় পেয়েছে। চোখ বড় বড় করে তাকিয়ে আছে আমার দিকে । আমি বললাম, এই গাবলু, তোর নাম কী?

গাবলু জবাব দিল না। বাবার কাছে সরে এল। বাবা বিরক্তমুখে বলল, আফনের কী বিষয়? চান কী?

আমি হাসিমুখে বললাম, আমাকে চিনতে পারছেন না! আমি হচ্ছি আপনাদের সহনিদ্রক। একসঙ্গে ঘুমালাম- মনে নেই? শেষরাতে জ্বর উঠে গেল। আপনি রিকশা ডেকে- আমাকে ধরাধরি করে তুলে দিলেন।

'মনে আছে। আফনে চান কী?'

'কিছু চাই না। আপনাদের সঙ্গে ঘুমাব-অনুমতি চাচ্ছি।'

'অনুমতির কী আছে? গভমেন্টের জায়গা। ঘুমাইতে ইচ্ছা হইলে ঘুমাইবে।'

আমি তাদের পাশে আমার স্লিপিংব্যাগ বিছালাম। পিতা এবং পুত্র দুজনেই চোখ বড় বড় করে তাকিয়ে আছে। ব্যাগের জিপার খুলে আমি ভেতরে ঢুকে পড়লাম। তাদের বিস্ময়ের সীমা রইল না।

আমি হাই তুলতে তুলতে বললাম, এই জিনিসটার নাম স্লিপিংব্যাগ। এর অনেক সুবিধা-ভেতরে ঢুকে জিপার লাগিয়ে দিলে শীত লাগবে না, মশা কামড়াবে না। বৃষ্টির সময় ভিজতে হবে না। চোর এসে তুলে নিয়ে চলে যেতে পারবে না। চোর যদি নিতে চায় আমাকে সুদ্ধ নিতে হবে।

বস্তা-ভাই তার বিস্ময় সামলাতে পারল না। ক্ষীণস্বরে বলল, এই জিনিসটার দাম কীরকম ভাইজান?

আমি ঘুম-ঘুম গলায় বললাম, জানি না। বলেই জিপার লাগিয়ে দিলাম। স্লিপিংব্যাগটা আমি আসলে এনেছি এই দুজনকে উপহার হিসেবে দিয়ে দেবার জন্যে। হিমুরা স্লিপিংব্যাগ নিয়ে পথে হাঁটে না। আমি ঠিক করেছি বাকি রাতটা স্লিপিংব্যাগে ঘুমুব। সকালে ব্যাগ থেকে বের হয়ে এক কাপ চা খাব। তারপর পিতা এবং পুত্রকে ব্যাগটা

• • •

উপহার দিয়ে চলে যাব। আহা, এই দুজন আরাম করে ঘুমাক । ছেলেটার চেহারা খুব মায়াকাড়া। কী নাম ছেলেটার? আচ্ছা, নামটা সকালে জানলেও হবে। এখন ভালো ঘুম পাচ্ছে। সামান্য দুশ্চিন্তাও হচ্ছে বাদলদের বাড়ি থেকে মোফাজ্জল এবং জহিরুলকে নিয়ে আসা হয়নি। এরা এতক্ষণে কী কাণ্ড করছে কে জানে। মনের আনন্দে ছাদ থেকে লাফিয়ে না পড়লেই হয়।

স্লিপিংব্যাগটা আসলেই ঘুমে আমার চোখ জড়িয়ে আসছে। !

'ভাইজান ও ভাইজান!'

'কী?'

'আমার ছেলে আফনের এই জিনিসটা একটু হাত দিয়া ছুইয়া দেখতে চায়।'

'উহু, ময়লা হবে। হাত যেন না দেয়।'

'জ্বে আচ্ছা।'

'ছেলের নাম কী?'

'সুলায়মান।'

'ছেলের মা কোথায়?'

'সেইটা ভাইজান এক বিরাট হিস্টুরি।'

'থাক বাদ দিন, বিরাট হিস্টুরি শোনার ইচ্ছা নেই, ঘুম পাচ্ছে।'

'ভাইজান!'

'হু।'

'জিনিসটার ভিতরে কি দুইজন শোয়া যায়?'

'তা যায়। বড় করে বানানো।'

'বালিশ আছে?'

'না, বালিশ নেই। বালিশের দরকার হয় না।'

'যদি কিছু মনে না নেন ভাইজান, সুলেমান জিনিসটার ভিতরে কী, একটু দেখতে চায়। তার খুব শখ হইছে।'

• • •

আমি ভেতর থেকে বের হয়ে এলাম। পিতা এবং পুত্রের কাছে ব্যাগ বুঝিয়ে দিলাম। তারা হতভম্ব হয়ে আমার দিকে তাকিয়ে আছে। তাদের হতভম্ব দৃষ্টি দেখে আমার চোখে পানি আসার উপক্রম হলো। হিমুদের চোখে পানি আসতে নেই- আমি ওদের পেছনে ফেলে দ্রুত হাটছি। রাস্তার শেষ মাথায় এসে একবার পেছনে ফিরলাম। পিতা-পুত্র দুজনই ব্যাগের ভেতর ঢুকেছে। দুজনই মাথা বের করে তাকিয়ে আছে আমার দিকে। কে জানে তারা কী ভাবছে।

@@

ঘুম ভেঙেই দেখি আমার বিছানার পাশের চেয়ারে বাদল বসে আছে। আমি চট করে চোখ বন্ধ করে ফেললাম। সাতসকালে বাদলের আমার পাশে বসে থাকার কথা না । আজ ২৩ ডিসেম্বর। কাল রাতে তার বিয়ে হয়েছে। বউ ফেলে ভোরবেলাতেই সে আমার কাছে চলে আসবে কেন? চোখ বন্ধ করে ব্যাপারটা একটু চিন্তা করা যাক।

আমি থাকি আগামসি লেনের একটা মেসে। মেসের ঠিকানা বাদল জানে না। শুধু বাদল কেন, আমার পরিচিত কেউই জানে না। বাদলকে সেই ঠিকানা খুঁজে বের করতে হয়েছে। সেটা তেমন জটিল কিছু না- আগে যে মেসে ছিলাম সেই মেসের ম্যানেজার নিতাই কুণ্ডু বর্তমান মেসের ঠিকানা জানেন। তাকে বলা হয়েছে আমার ঠিকানা কাউকে দেবেন না- তার পরেও ভদ্রলোক দিয়েছেন। বাদল নিশ্চয়ই এমন কিছু বলেছে বা

করেছে যে ঠিকানা না দিয়ে ভদ্রলোকের উপায় ছিল না। খুব সম্ভব কেঁদে ফেলেছে। বাদল খুব সহজে কাঁদতে পারে।

একবার মেসে ঢুকে পড়ার পর আমার ঘরে ঢোকা অবিশ্যি খুবই সহজ। আমি দরজা এবং জানালা সব খোলা রেখে ঘুমাই। হিমুকে তা-ই করতে হয়। আমার বাবা আমার জন্যে যে-উপদেশনামা লিখে রেখে গেছেন তার সপ্তম উপদেশ হচ্ছে-

> “নিদ্রা ও জাগরণের যে বাধাধরা নিয়ম আছে, যেমন দিবসে জাগরণ নিশাকালে নিদ্রা- এসব নিয়ম মানিয়া চলার কোনো আবশ্যকতা নাই । কোনোরকম বন্ধনে নিজেকে বাঁধিও না। খোলা মাঠ বা প্রান্তরে নিদ্রা দিতে চেষ্টা করিবে । কোনো প্রকোষ্ঠে শয়ন করিলে সেই প্রকোষ্ঠের দরজা-জানালা সবই খুলিয়া রাখিবে যেন নিদ্রাকালে খোলা প্রান্তরের সহিত তোমার নিদ্রাকক্ষের যোগ সাধিত হয়।
>
> নিদ্রাকালে তস্কর বা ডাকাত আসিয়া তোমার মালামাল নিয়া পলায়ন করিবে এই চিন্তা মাথায় রাখিও না, কারণ তস্কর আকর্ষণ করিবার মতো কিছু তোমার কখনোই থাকিবে না। যদি থাকে তবে তাহা তস্কর কর্তৃক নিয়া যাওয়াই শ্রেয় ।”

বাবার উপদেশ আমি অনেকদিন থেকেই মেনে চলছি। খোলা প্রান্তরে শোয়া সম্ভব হচ্ছে না— দরজা-জানালা-খোলা ঘরে ঘুমুচ্ছি। তস্করের হাতে পড়েছি তিনবার। প্রথমবার সে একটা দামি জিনিসই নিয়ে গেছে- ওয়াকম্যান। সনি কোম্পানির ওয়াকম্যান আমাকে উপহার দিয়েছিল রূপা। রূপার উপহার দেয়ার পদ্ধতি খুব সুন্দর। গিফট-র্যাপে মুড়ে লাল রিবনের ফুল লাগিয়ে বিরাট শিল্পকর্ম। রূপা গিফট আমার হাতে দিয়ে বলল, নাও, তোমার জন্মদিনের উপহার।

আমি বললাম, আজ তো আমার জন্মদিন না।

• • •

সে নিজের মাথার চুলে বিলি কাটতে কাটতে বলল, তোমার কবে জন্মদিন সেটা তো আমি জানি না, তুমি আমাকে বলবেও না। কাজেই আমি ধরে নিলাম আজই জন্মদিন ।

‘ও আচ্ছা।’

‘ও আচ্ছা না, বলো থ্যাংক য়্যু। উপহার পেলে ধন্যবাদ দেয়া সাধারণ ভদ্রতা। মহাপুরুষরা ভদ্রতা করেন না, তা তো না।’

‘ধন্যবাদ। কী আছে এর মধ্যে?’

‘একটা ওয়াকম্যান। তুমি তো পথে-পথেই ঘুরে বেড়াও । মাঝে মাঝে এটা কানে দিয়ে ঘুরবে। আমার পছন্দের তেরোটা গান আমি রেকর্ড করে দিয়েছি।’

‘আবারও ধন্যবাদ।’

আমি খুব যত্ন করে টেবিলের মাঝামাঝি জায়গায় রূপার উপহার সাজিয়ে রাখলাম। সাজিয়ে রাখা পর্যন্তই। ব্যাটারির অভাবে গান শোনা গেল না। রূপা মূল যন্ত্র দিয়েছে, ব্যাটারি দেয়নি। আমারও কেনা হয়নি। মাঝে মাঝে যন্ত্রটা শুধুশুধু কানে দিয়ে বসে থাকতাম। কানের ফুটো বন্ধ থাকার জন্যই বোধহয় শোঁশোঁ শব্দ হতো। সেই শব্দও কম ইন্টারেস্টিং ছিল না। যা-ই হোক, একরাতে চোর (বাবার ভাষায়- তস্কর) এসে আমাকে ব্যাটারি কেনার যন্ত্রণা থেকে বাঁচাল।

দ্বিতীয় দফায় তস্কর এসে আমার স্যান্ডেলজোড়া নিয়ে গেল। হিমুর স্যান্ডেল থাকার কথা না- খালিপায়ে হাঁটাহাটি করার কথা। তার পরও একজোড়া চামড়ার স্যান্ডেল কিনেছিলাম। দাম নিয়েছিল দুশো তেত্রিশ টাকা। সাতদিনের মাথায় স্যান্ডেল চলে গেল ।

তৃতীয় দফায় চোরের হাতে আমার বিছানার চাদর এবং বালিশ চলে গেল। আমার ঘুমন্ত অবস্থায় চোর কী করে বিছানার চাদর এবং বালিশ নিয়ে গেল সেই রহস্যের সমাধান এখনও হয়নি ।

• • •

চোর-বিষয়ক সমস্যা নিয়ে এখন মাথা ঘামাবার কিছু নেই- আমার সামনে জটিল সমস্যা বসে আছে– বাদল। আমি চট করে দ্বিতীয়বার তাকে দেখে নিলাম । তার চোখেমুখে হতভম্ব ভাব। রাতে একফোঁটাও ঘুমায়নি তাও বোঝা যাচ্ছে। চোখের নিচে এক রাতেই কালি পড়ে গেছে। আনন্দময়নিশি-জাগরণে চোখের নিচে কালি পড়ে না। কাজেই গতরাতটা তার কাছে ছিল দুঃস্বপ্নের মতো। তা হলে কি তার বিয়ে হয়নি?

আমি চোখ বন্ধ রেখেই বললাম, বাদল, তোর বিয়েটা কি কোনো কারণে ভেঙে গেছে?

বাদল বলল, হু।

'চা খাবি?'

'হু।'

'নিচে চলে যা। রাস্তা পার হলেই দেখবি তোলা উনুনে বাচ্চা এক ছেলে চা বানাচ্ছে। ওর নাম মফিজ। মফিজকে বলে আয়, দুকাপ চা পাঠাতে।'

'আমার বিয়েটা যে ভেঙে যাবে সেটা কি তুমি আগে থেকেই জানতে?'

'আগে থেকে জানব কীভাবে? আমি কি পীর-ফকির নাকি?'

'আমার মনে হয় তুমি জানতে। জানতে বলেই বরযাত্রী হিসেবে তুমি বিয়েতে যাওনি।'

'বরযাত্রী হিসেবে যাইনি, কারণ আমাকে ফুপা নিষেধ করে দিয়েছিলেন।'

'তোমাকে তো আমি কিছু বলিনি- তা হলে তুমি বুঝলে কী করে যে আমার বিয়ে হয়নি।'

'তোর চেহারা দেখে বুঝেছি। মানুষের সমগ্র অতীত তার চেহারায় লেখা থাকে। যারা সেই লেখা পড়তে পারে তারা মানুষকে দেখেই হুড়হুড় করে অতীত বলে দিতে পারে।'

'তুমি পার?'

'বেশি পারি না- সামান্য পারি। যা, চার কথা বলে আয় ।'

• • •

বাদল উঠে দাঁড়াল। বাদলের চেহারা খুব সুন্দর। আজ এই সকালের আলোতে তাকে আরও সুন্দর লাগছে। ক্রিম কালারের এই শার্টটা তাকে খুব মানিয়েছে। যদি বিয়েটা হতো তা হলে ভোরবেলায় বাদলকে দেখে আঁখি মেয়েটার মন ভালো হয়ে যেত। যতই মেয়েটা বাদলের কাছাকাছি যেত ততই সে বাদলকে পছন্দ করত। আমার ফুপা এবং ফুপুর চরিত্রের ভালো যা আছে তাঁর সবই আছে বাদলের মধ্যে। ফুপা এবং ফুপুর অন্ধকার দিকের কিছুই বাদল পায়নি। বাদলের জন্যে আমার মনটা খারাপ হয়ে গেল। যদিও হিমুর মন-খারাপ হতে নেই। বাবার উপদেশনামার তৃতীয় উপদেশ হচ্ছে-

> "জগতের কর্মকাণ্ড চক্ষু মেলিয়া দেখিয়া যাইবে। কোনোক্রমেই বিচলিত হইবে না। আনন্দে বিচলিত হইবে না, দুঃখেও বিচলিত হইবে না। সুখ দুঃখ এইসব নিতান্তই তুচ্ছ মায়া। তুচ্ছ মায়ায় আবদ্ধ থাকিলে জগতের প্রধান মায়ার স্বরূপ বুঝিতে পারবে না।"

মুশকিল হচ্ছে, জগতের প্রধান মায়ার স্বরূপ বোঝার জন্যে কোনোরকম ব্যস্ততা এখনও তৈরি হয়নি। আমার আশেপাশের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মায়া আমাকে বড়ই বিচলিত করে।

মফিজ আমার জন্য যে-চা বানায় তার নাম- ইসপিসাল, ডাবলপাত্তি। এই চায়ের বিশেষত্ব হচ্ছে ঘন লিকার, প্রচুর দুধ, প্রচুর চিনি। ইসপিসাল চা কাপে করে আসে না- প্রমাণ সাইজের গ্লাসভরতি হয়ে আসে। এক গ্লাস ইসপিসাল ডাবলপাত্তি খেলে সকালের নাশতা খেতে হয় না।

বাদল চায়ের গ্লাসে চুমুক দিচ্ছে। তার মুখ থমথম করছে। আমি বললাম, সিগারেট খাবি?

'না, সিগারেট তো খাই না।'

'চা খেতে খেতেই ঘটনা কী বল।'

'ঘটনা বলে কী হবে?'

'তা হলে ভোররাতে এসেছিস কেন?

• • •

বাদল চুপ করে রইল। আমি বললাম, কিছু বলতে ইচ্ছে না করলে বলতে হবে না। চা খেয়ে চলে যা ।

'দেখি একটা সিগারেট দাও, খাই।'

আমি সিগারেট দিলাম। বাদল সিগারেট ধরিয়ে গম্ভীর মুখে প্রফেশনালদের মতো টানছে। নাকে-মুখে ভোঁসভোঁস করে ধোঁয়া ছাড়ছে।

'হিমুদা!'

'বল।'

'বলার মতো কোনো ঘটনা না। লজ্জায় আমার মাথা কাটা যাচ্ছে। আমরা তো সবাই গেলাম- পনেরোটা গাড়ি, দুটো মাইক্রোবাসে প্রায় একশোজন বরযাত্রী। আগে থেকে কথা হয়ে আছে রাত আটটায় কাজি চলে আসবে। বিয়ে পড়ানো হবে। কাবিনের অ্যামাউন্ট নিয়ে যেন ঝামেলা না হয় সেজন্যে সব আগে থেকেই ঠিকঠাক করা। পাচ লক্ষ এক টাকা কাবিন ।

কাজি চলে এল আটটার আগেই । উকিলবাবা কবুল পড়িয়ে মেয়ের সই নিতে যাবে-মেয়ের বাবা বললেন, একটু সবুর করুন। নয়টা বেজে গেল। মেয়েপক্ষরা হঠাৎ বলল, আপনাদেরও খাওয়া হয়ে হয়ে যাক। দুই-তিন ব্যাচে খাওয়া হবে, সময় লাগবে। তখন বাবা বললেন, বিয়ে হোক, তারপর খাওয়া। বিয়ের আগে কিসের খাওয়া! মেয়ের মামা বললেন, একটু সমস্যা আছে। সামান্য দেরি হবে।

কী ব্যাপার তারা কিছুতেই বলতে চায় না। অনেক চাপাচাপির পর যা জানা গেল তা হলো- মেয়ের নাকি সকালবেলায় তার মা'র সঙ্গে খুব ঝগড়া হয়েছে। মেয়ে রাগ করে তার কোনো-এক বন্ধুর বাড়িতে চলে গেছে। সেখান থেকে টেলিফোন করেছিল, বলেছে চলে আসবে। কোথায় আছে তা কেউ জানে না বলে তাকে আনার জন্যেও কেউ যেতে পারছে না।

বাবা রাগ করে বললেন, মেয়ে কি তার প্রেমিকের বাড়িতে গিয়ে উঠেছে? এই কথায় মেয়ের মামা খুব রাগ করে বললেন, এসব নোংরা কথা কী বলছেন? আমাদের

মেয়ে সেরকম না। মা'র সঙ্গে ঝগড়া হয়েছে। টেলিফোনে কথা হয়েছে। চলে আসবে, একটু অপেক্ষা করুন।

আমরা রাত সাড়ে এগারোটা পর্যন্ত অপেক্ষা করলাম। বাসায় এসেও বিরাট লজ্জায় পড়লাম। বাবা বাসায় ব্যান্ডপার্টির ব্যবস্থা করে গিয়েছিলেন। বর-কনে আসবে, ব্যান্ড বাজা শুরু হবে। আমাদের ফেরত আসতে দেখে ব্যান্ড বাজা শুরু হলো। উদ্দাম বাজনা। পাড়ার লোক ভেঙে পড়ল। লজ্জায় আমার ইচ্ছা করছিল..."

'কী ইচ্ছা করছিল?'

বাদল চুপ করে গেল। সে আমার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে অন্যদিকে তাকিয়ে আছে। মনে হয় চোখের পানি সামলাচ্ছে। আমি বললাম, তুই আমার কাছে এসেছিস কেন?

'এমনি এসেছি। মনটা ভালো করার জন্যে এসেছি।'

'মন ভালো হয়েছে?'

'না।'

'তা হলে চল আমার সঙ্গে, হাঁটাহাটি করবি। হাঁটাহাটি করলে মন ভালো হয়।'

'কে বলেছে?'

'আমি বলছি।'

বাদল উঠে দাঁড়িয়ে বলল, চলো ।

'চিড়িয়াখানায় যাবি?'

'চিড়িয়াখানায় যাব কেন?'

'জীবজন্তু দেখলে মন দ্রুত ভালো হয়। চল বাঁদরের খাঁচার সামনে দাড়িয়ে কিছুক্ষণ ওদের লাফালাফি ঝাঁপাঝাপি দেখে আসি। তারপর চল হাতির পিঠে চড়ি। পারহেড দশ টাকা নিয়ে ওরা হাতির পিঠে চড়ায়। তোর কাছে টাকা আছে তো?'

'আছে। আমরা মিরপুর পর্যন্ত কি হেঁটে যাব?'

• • •

'অবশ্যই! ভালো কথা— তোর "হতে পারত শ্বশুরবাড়ি" টেলিফোন নাম্বার কি তোর কাছে আছে? টেলিফোন করে দেখতাম আঁখি বাসায় ফিরেছে কি না। একটা মেয়ে রাগ করে বাড়ি ছেড়ে চলে গেছে- সে ফিরেছে না সেটা জানা আমাদের দায়িত্ব না? আছে টেলিফোন নাম্বার?

'হু।'

'তুই ওদের টেলিফোন নাম্বার পকেটে নিয়ে ঘুরছিস কেন?'

'পকেটে করে ঘুরছি না- তোমার এখানে আসা যখন ঠিক করেছি তখন মনে হয়েছে তুমি ওদের টেলিফোন নাম্বার চাইতে পার, তাই মনে করে নিয়ে এসেছি।'

'ভালো করেছিস।'

'তুমি কি সত্যি মিরপুর পর্যন্ত হেঁটে যাবে?'

'হু। ঘণ্টা দুএক লাগবে- এটা কোনো ব্যাপারই না।'

আমি হলুদ পাঞ্জাবি গায়ে দিলাম। মনে হচ্ছে আজকের দিনটি হবে আমার জন্যে কর্মব্যস্ত একটি দিন ।

পথে নেমেই শুনি কোকিল ডাকছে। তার মানে কী? শীতকালে কোকিল ডাকছে কেন?

'বাদল।'

'হু।'

'কোকিল ডাকছে শুনছিস।'

'হু।'

'ব্রেইন-ডিফেক্ট কোকিল— অসময়ে ডাকাডাকি করছে।'

'হু।'

'তুই কি ঠিক করেছিস হুর বেশি কিছু বলবি না?'

'কথা বলতে ইচ্ছা করছে না।'

'কোকিল সম্পর্কে একটা তথ্য শুনবি?'

• • •

‘বলো।’

‘কোকিলের গলা কিন্তু এমিতে খুব কর্কশ। সে মধুর গলায় তার সঙ্গীকে ডাকে মেটিং সিজনে। তখনই কোকিল-কণ্ঠ শুনে আমরা মুগ্ধ হই।’

‘ভালো।’

‘তোর কি একেবারেই কথা বলতে ইচ্ছা করছে না?’

‘না।’

‘পথে হাঁটার নিয়ম জানিস?’

‘হাঁটার আবার নিয়ম কী, হাঁটলেই হলো।’

‘সবকিছুর যেমন নিয়ম আছে- হাঁটারও নিয়ম আছে। হাঁটতে হয় একা একা। বল তো কেন?’

‘জানি না।’

দুজন বা তারচেয়ে বেশি মানুষের সঙ্গে হাঁটলে কথা বলতে হয়। কথা বলা মানেই হাঁটার প্রথম শর্ত ভঙ্গ করা। হাঁটার প্রথম শর্ত হচ্ছে- নিঃশব্দে হাঁটা।

‘হু।’

‘হাঁটার দ্বিতীয় শর্ত হচ্ছে হাঁটার সময় চারদিকে কী হচ্ছে দেখা, কিন্তু গভীরভাবে দেখার চেষ্টা না করা । ইংরেজিতে ‘Glance’— চট করে তাকানো, ‘Look’ না।’

‘হু।’

হাঁটার তৃতীয় শর্ত হচ্ছে পথে কোথাও থামা চলবে না। কাজেই তুই চট করে দাঁড়িয়ে পড়বি না।’

‘আচ্ছা ।’

‘পেছনদিকে তাকানো চলবে না।’

‘আচ্ছা।’

‘তোর কি একেবারেই কথা বলতে ইচ্ছে করছে না?’

বাদল জবাব দিল না। আমি বললাম, বাদল, তুই হাঁটার চতুর্থ শর্ত ভঙ্গ করছিস ।

• • •

‘চতুর্থ শর্তটা কী?’

‘তুই মাটির দিকে তাকিয়ে হাঁটছিস। হাঁটার সময় মাটির দিকে তাকিয়ে হাঁটা চলবে না।

‘ও আচ্ছা ।’

‘তোর হাঁটতে কষ্ট হলে রিকশা নিয়ে নিই।’

‘কষ্ট হচ্ছে না ।’

‘আচ্ছা, তুই একটা প্রশ্নের জবাব দে। খুব সহজ প্রশ্ন। রিকশাওয়ালাদের রিকশায় প্যাডেল চাপাতে হয় । এই কাজটা করার জন্যে তাদের সবচে ভালো পোশাক হচ্ছে ফুলপ্যান্ট কিংবা পায়জামা । পুরানো কাপড়ের দোকানে সস্তায় ফুলপ্যান্ট পাওয়া যায়। রিকশাওয়ালারা কিন্তু কেউই ফুলপ্যান্ট বা পায়জামা পরে না। তারা সবসময় পরে লুঙ্গি । এখন বল, কেন? খুব সহজ ধাধা।’

‘জানি না কেন । ধাঁধা নিয়ে ভাবতে ইচ্ছা করছে না।’

‘কী নিয়ে ভাবতে ইচ্ছা করছে?’

‘কোনোকিছু নিয়েই ভাবতে ইচ্ছা করছে না।’

‘চোখের কতকগুলি প্রতিশব্দ বল তো! প্রথমটা আমি বলে দিচ্ছি- আঁখি ।’

‘বললাম তো হিমুদা, ধাঁধার খেলা খেলতে ইচ্ছা করছে না।’

আহা আয়-না একটু খেলি! বল দেখি চোখ, আঁখি...তারপর?’

‘চোখ, আঁখি, নয়ন, নেত্র, অক্ষি, লোচন...’

‘গুড, ভালোই তো বলেছিস!’

‘হিমুদা, খিদে লেগে গেছে।’

‘খিদে ব্যাপারটা কেমন ইন্টরেস্টিং দেখেছিস- তোর যত ঝামেলা, যত সমস্যাই থাকুক, খিদের সমস্যা সবসময় সবচেয়ে বড় সমস্যা।’

‘ফিলসফি করবে না। ফিলসফি ভালো লাগছে না।’

‘খিদের বন্ধন থেকে মুক্তি পাওয়ার উপায় জানিস।’

• • •

'না।'

'খুব সহজ উপায়। বাহাত্তুর ঘণ্টা কিচ্ছু না-খেয়ে থাকা- পানি পর্যন্ত না। বাহাত্তুর ঘণ্টার পর এক চামুচ বা দুচামুচ পানি খাওয়া যেতে পারে। বাহাত্তুর ঘণ্টা পার করার পর দেখবি খিদেবোধ নেই- শরীরে ফুরফুরে ভাব। মাথার ভেতরটা অসম্ভব ফাঁকা। মাঝে মাঝে ঝনঝন করে আপনা-আপনি বাজনা বেজে ওঠে । আলোর দিকে তাকালে নানান রঙ দেখা যায়- তিনকোণা কাচের ভেতর দিয়ে তাকালে যেমন রঙ দেখা যায় তেমন রঙ।'

'তুমি দেখেছ?'

'হু।'

'কতদিন না-খেয়ে ছিলে?'

'বাহাত্তুর ঘণ্টা থাকার কথা, বাহাত্তুর ঘণ্টা ছিলাম।'

'বাহাত্তুর ঘণ্টা থাকার কথা তোমাকে কে বলল?'

'বাবা বলেছিলেন। আমার গুরু হচ্ছেন আমার পিতা। মহাপুরুষ বানাবার কারিগর। তোর কি খিদে বেশি লেগেছে?'

'হু।'

'কী খেতে ইচ্ছে করছে?'

'যা খেতে ইচ্ছে করছে তা-ই খাওয়াবে?'

'আমি কি ম্যাজিশিয়ান নাকি, তুই যা খেতে চাইবি– মন্ত্র পড়ে তা-ই এনে দেব?'

'তুমি ম্যাজিশিয়ান তো বটেই- অনেক বড় ম্যাজিশিয়ান। অন্যরা কেউ জানে না, আমি জানি । আমার বাসি পোলাও খেতে ইচ্ছে করছে।'

'বাসি পোলাও মানে?'

'গতরাতে রান্না করা হয়েছে। বেঁচে গেছে, ফ্রিজে রেখে দেয়া হয়েছে। সেই বাসি পোলাওয়ের সঙ্গে গরম-গরম ডিমভাজা ।'

'খুব উপাদেয় খাবার?'

• • •

'উপাদেয় কি না জানি না। একবার খেয়েছিলাম, সেই স্বাদ মুখে লেগে আছে। মাঝে মাঝে আমার এই খাবারটা খেতে ইচ্ছা করে। বাসি পোলাও তো আর চাইলেই পাওয়া যায় না। তবে তুমি চাইলে পাবে।'

'আমি চাইলে পাব কেন?'

'কারণ তুমি হচ্ছ মহাপুরুষ।'

মহাপুরুষরা বুঝি চাইলেই বাসি পোলাও পায়?'

বাদল জবাব দিল না। আমি বললাম, আয় লাক ট্রাই করতে করতে যাই । রেসিডেনশিয়াল এরিয়ার ভেতর ঢুকে যাই। সব বাড়ির সামনে দাঁড়াব। কলিংবেল টিপব- বাড়ির মালিক বের হলে বলব, আমরা একটা সার্ভে করছি। সকালবেলা কোন বাড়িতে কি নাশতা হয় তার সার্ভে। ইনকাম গ্রুপ এবং নাশতার প্রোফাইল।

'কী যে তুমি বল!'

'আরে আয় দেখি !'

'তুমি কি সত্যি সিরিয়াস।'

'অবশ্যই সিরিয়াস। তবে সার্ভের কথা বলে শুধুহাতে উপস্থিত হওয়া চলবে না। কাগজ লাগবে, বলপয়েন্ট লাগবে। 'তুই বলপয়েন্ট আর কাগজ কিনে দে।'

'আমার ভয়-ভয় লাগছে হিমুদা।'

'ভয়ের কিছু নেই, আয় তো!'

প্রথম যে-বাড়ির সামনে আমরা দাঁড়ালাম সেই বাড়ির নাম উত্তরায়ণ। বেশ জমকালো বাড়ি। গেটে দারোয়ান আছে। গেটের ফাঁক দিয়ে বাড়ির মালিকের দুটো গাড়ি দেখা যাচ্ছে। একটা গাড়ি মনে হয় কিছুদিনের মধ্যে কেনা হয়েছে। ঝকঝক করছে।

আমি বললাম, আমরা স্ট্যাটিসটিক্যাল ব্যুরো থেকে এসেছি। বাড়ির মালিকের সঙ্গে কথা বলা দরকার ।

'আপনার নাম?'

• • •

‘হিমু।’

‘কার্ড দেন।’

‘আমার সঙ্গে কার্ড নেই। আমরা ছোট কর্মচারী, আমাদের সঙ্গে তো কার্ড থাকে না। আপনি ভেতরে গিয়ে খবর দিন। বলবেন স্ট্রাটিসটিক্যাল ব্যুরো।’

দারোয়ান ভেতরে চলে গেল। বাদল বলল, ভয়-ভয় লাগছে হিমুদা। শেষে হয়তো পুলিশে দিয়ে দেবে। মারধোর করবে।’

‘ভয়ের কিছু নেই।’

‘তোমার খালি পা। খালি পা দেখেই সন্দেহ করবে।’

মানুষ চট করে পায়ের দিকে তাকায় না। তাকায় মুখের দিকে। তা ছাড়া আমাদের ভেতরে নিয়ে বসাবে। তখন খালিপায়ে বসলে ভাববে স্যান্ডেল বাইরে খুলে এসেছি।’

‘তোমার মারাত্মক বুদ্ধি হিমুদা।’

‘তোর মন-স্যাতসেঁতে ভাবটা কি এখন দূর হয়েছে?’

‘হু।’

‘একটা উত্তেজনার মধ্যে তোকে ফেলে দিয়েছি যাতে আঁখি মেয়েটির চিন্তা থেকে আপাতত মুক্তি পাস।’

দারোয়ান এসে বলল, যান, ভিতরে যাইতে বলছে।

আমরা রওনা হলাম। বাদল ভালো ভয় পেয়েছে। তার চোখেমুখে ঘাম। তবে সে আঁখির হাত থেকে এখন মুক্ত।

আমদের বসালো ড্রয়িংরুমের পাশে ছোট একটা ঘরে। এটা বোধহয় গুরুত্বহীন মানুষদের বসার জন্যে ঘর। দেশ থেকে লোক আসবে- এখানে বসবে। বিল নিতে আসবে, বসবে এই খুপরিতে।

এক ভদ্রলোক গম্ভীরমুখে ঢুকলেন। বয়স্ক লোক। সকালবেলায় হঠাৎ-যন্ত্রণায় তিনি বিরক্ত। বিরক্তি চাপার চেষ্টা করছেন, পারছেন না।

‘আপনাদের ব্যাপারটা কী?’

• • •

আমি উঠে দাঁড়িয়ে অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে বললাম, স্যার, আমরা ঢাকা ইউনিভার্সিটির সোসিওলজি ডিপার্টমেন্ট থেকে একটা সমীক্ষা চালাচ্ছি। সমীক্ষাটা হচ্ছে ঢাকা শহরের মানুষদের ব্রেকফাস্টের প্রোফাইল ।

ভদ্রলোক বিস্মিত হয়ে বললেন, কিসের প্রোফাইল?

‘কোন পরিবারে কী ধরনের নাশতা খাওয়া হয় এর উপর একটা জেনারেল স্টাডি । আজ আপনাদের বাসায় কী নাশতা হয়েছে, আপনি কী খেয়েছেন?’

‘সকালে তো আমি নাশতাই খাই না। একটা টোষ্ট খাই আর এক কাপ কফি খাই ।’

আমি গম্ভীর মুখে কাগজে লিখলাম— টোষ্ট, কফি ।

‘কফি কি ব্ল্যাক কফি?’

‘না, ব্ল্যাক কফি না, দুধ-কফি।’

‘বাড়িতে নিশ্চয়ই অন্য সবার জন্যে কোনো-একটা নাশতা তৈরি হয়েছে, সেটা কী?’

‘দাঁড়ান, আমার ভাগ্নিকে পাঠাই। ও বলতে পারবে। এই জাতীয় স্টাডির কথা প্রথম শুনলাম। যেসব স্টাডি হবার সেসব হচ্ছে না— নাশতা নিয়ে গবেষণা!’

ভদ্রলোক চলে গেলেন এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গে যে-মেয়েটি ঢুকল সে মীরা। গভীর রাতে তার সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল। কুড়িয়ে পাওয়া মানিব্যাগ এই মেয়েটির হাতেই দিয়েছি। তবে এমন জমকালো বাড়িতে নয়। মেয়েটি আমাকে চিনতে পারল না। সেও ভদ্রলোকের মতোই বিরক্তমুখে বলল, আজ এ-বাড়িতে কোনো নাশতা হয়নি। গতরাতে বাড়িতে একটা উৎসব ছিল। বড়মামার পঞ্চাশতম জন্মদিন। সেই উপলক্ষে পোলাও রান্না হয়েছে। অনেক পোলাও বেঁচে গেছে। ডীপ ফ্রিজে রাখা ছিল। সকালে সে-পোলাও গরম করে দেয়া হয়েছে।

আমি সহজ গলায় বললাম, আমরা দুজন কি সেই বাসি পোলাও খেয়ে দেখতে পারি? পোলাওয়ের সঙ্গে ডিমভাজা ।

বাদল চোখমুখ শুকনো করে ফেলল। মীরা তাকাল তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে।

• • •

আমি বললাম, তারপর মীরা, তুমি ভালো আছ?

মীরা এখনও তাকিয়ে আছে।

'আমাকে চিনতে পারছ তো? ঐ যে তোমাকে টাকা দিয়ে এলাম সাঁইত্রিশ হাজার নয়শো একুশ টাকা?'

মীরা পুরো হকচকিয়ে গেছে। মেয়েরা হতচকিত অবস্থা থেকে চট করে উঠে আসতে পারে। মীরা পারছে না। মেয়েটি মনে হয় সহজ-সরল জীবনে বাস করে। বাইরের পৃথিবীর সঙ্গে তেমন যোগ নেই তার জীবনে হকচকিয়ে যাবার ঘটনা তেমন ঘটেনি।

'মীরা, আমাকে চিনতে পারছ তো?'

'হু।'

'ভেরি গুড! আমাদের নাশতা দিয়ে দাও। খেয়ে চলে যাই । স্ট্যাটিসটিক্যাল ডাটা সংগ্রহের জন্য ঘুরে বেড়াচ্ছি এসব ধাপ্পাবাজি। আমরা আসলে নাশতা খেতে এসেছি।'

'ও আচ্ছা ।'

আসল কথা বলতে ভুলে গেছি, নাশতা একজনের জন্যে আনবে, শুধু বাদলের জন্যে । আমি একবেলা খাই । বাদলের সঙ্গে তোমার পরিচয় করিয়ে দেয়া হয়নি। এ হচ্ছে আমার ফুপাতো ভাই। পিএইচ.ডি. করার জন্যে কোথায় যেন গিয়েছে। জায়গাটা কোথায় রে বাদল?'

বাদল মাথা নিচু করে ছিল। সে মাথা নিচু করে ক্ষীণস্বরে বলল, কানাডা।

অপরিচিত মানুষের সামনে বাদল একেবারেই সহজ হতে পারে না। মেয়েদের সামনে তো নয়ই। বিশেষ করে মেয়ে যদি সুন্দরী হয় তা হলে বাদলের জিহবা জড়িয়ে যায়। তোতলামি শুরু হয়। রাতে মীরা মেয়েটাকে যত সুন্দর দেখাচ্ছিল দিনে তারচেয়েও বেশি সুন্দর লাগছে।

ভেতর থেকে ভারি গলায় কে যেন ডাকল— মীরা মীরা!

• • •

মনে হয় শুরুতে যে-ভদ্রলোক এসেছিলেন তিনিই ডাকছেন । সকালে কী নাশতা হয় তার তালিকা দিতে মীরার এত দেরি হবার কথা না। মীরা বলল, আপনারা বসুন। আমি আসছি।

বাদল মাথা তুলল। তার কানটান লাল হয়ে আছে। বিয়ে না হয়ে ভালোই হয়েছে, বিয়ে হলে বাদল তো মনে হয় সারাক্ষণ কান লাল করে বসে থাকত। পার্মানেন্ট তোতলা হয়ে যেত। কেমন আছিসরে বাদল? জিজ্ঞেস করলে উত্তর দিত- ভা ভা ভা ল ।

'হিমুদা।'

'হু।'

'এই মেয়েটাকে তুমি চেন?'

'হু।'

'আশ্চর্য তো!'

'আশ্চর্যের কী আছে! সুন্দরী মেয়ের সঙ্গে আমার পরিচয় থাকতে পারে না?'

'সেইজন্যে আশ্চর্য বলছি না। অন্য কারণে আশ্চর্য বলছি।'

'কী কারণ?'

'বাসি পোলাও খেতে চেয়েছি- তুমি এই বাড়িতে নিয়ে এলে। এই বাড়িতে আজই বাসি পোলাও নাশতা।'

'একে বলে কাকতালীয় যোগাযোগ।'

'কাকতালীয় না- এর নাম হিমুতালীয়। তোমার যে আধ্যাত্মিক ক্ষমতা আছে তা আমি গোড়া থেকেই জানি- তবে ক্ষমতাটা যে এত প্রবল তা জানতাম না।'

'আমিও জানতাম না।'

'হিমুদা!'

'হু?'

'তুমি কাউকে দেখে তাঁর ভবিষ্যৎ বলতে পার?'

'আমার নিজের ভবিষ্যৎ বলতে পারি-অন্যেরটা পারি না ।'

• • •

‘তোমার ভবিষ্যৎ কী?’

‘বলা যাবে না।’

‘হিমুদা।’

‘হু?’

‘তুমি কি জানতে এ-বাড়িতে আজ নাশতা হচ্ছে বাসি পোলাও?’

‘জানতাম না ।’

মীরা ঢুকেছে। তার হাতে ট্রে। ট্রে ভরতি খাবার। মীরার পেছনে একটা কাজের মেয়েতার হাতেও ট্রে। শুধু যে বাসি পোলাও এসেছে তা না, পরোটা এসেছে, গোশত এসেছে। ছোট ছোট গ্লাসে কমলার রস । মীরা বলল, আপনারা চা খাবেন, না কফি খাবেন?

আমি বাদলকে বললাম, কী খাবি বল ।

বাদল বলল, ক ক কফি ।

বাদলকে তোতলামিতে ধরে ফেলেছে।

মীরা আমার সামনে বসল। তার বসার ভঙ্গি বলে দিচ্ছে সে নিজেকে তৈরি করে এসেছে। কী কী বলবে সব ঠিক করা। নাশতা নিয়ে ঢোকার আগে সে নিশ্চয়ই মনেমনে রিহার্সেল দিয়েও এসেছে। মীরা বলল, আপনার নাম হিমু? উনি হিমুদা বলে ডাকছিলেন।

‘আমার নাম হিমু।’

‘ঐ রাতে আপনাকে ধন্যবাদ দেয়া হয়নি। আসলে আমি আর বাবা আমরা দুজনেই ভেবেছিলাম টাকাটা কখনো পাওয়া যাবে না । বাবা অবিশ্যি বারবারই বলছিলেন টাকাটা ফেরত পাওয়া যাবে। তবে এটা ছিল নিজেকে সান্ত্বনা দেয়ার জন্যে কথার কথা। আপনি যখন সত্যি সত্যি মানিব্যাগ নিয়ে উপস্থিত হলেন তখন আমরা এতই হতভম্ব হয়ে গেলাম যে আপনাকে ধন্যবাদ দিতে পর্যন্ত ভুলে গেলাম। আপনি যেমন হুট করে উপস্থিত হলেন তেমনি হুট করে চলেও গেলেন। তখন বাবা খুব হৈচৈ শুরু করলেন,

মানুষটা গেল কোথায়, মানুষটা গেল কোথায়? বাবা খুব অল্পতে অস্থির হয়ে পড়েন। তখন তার ব্লাডপ্রেশারও বেড়ে যায়। তিনি খুবই অস্থির হয়ে পড়লেন। আপনাদের খুঁজে বের করার জন্যে রাত আড়াইটার সময় ঘর থেকে বের হলেন।

'বল কী!'

'আমার বাবা খুব অস্থির প্রকৃতির মানুষ। তার সঙ্গে কথা না বললে বুঝতে পারবেন না। উনি রাত সাড়ে তিনটা পর্যন্ত আপনাদের খুঁজে বেড়ালেন। আমি একা একা ভয়ে অস্থির।'

'একা, কারণ আমাদের সংসারে দুজনই মানুষ। আমি আর আমার বাবা। যা-ই হোক, বাবা বাসায় ফিরেই বললেন, মীরা শোন, আমি নিশ্চিত টাকা নিয়ে যারা এসেছিল তারা মানুষ না, অন্যকিছু।'

'আমি বললাম, অন্যকিছু মানে?'

'বাবা বললেন, অন্যকিছুটা কী আমি নিজেও জানি না। আমাদের দৃশ্যমান জগতে মানুষ যেমন বাস করে, মানুষ ছাড়া অন্য জীবরাও বাস করে। তাদের কেউ এসেছিলেন। বাবা এমনভাবে বললেন, যে, আমি নিজেও প্রায় বিশ্বাস করে ফেলেছিলাম। সেই কারণেই আপনাকে দেখে এমন চমকে উঠেছিলাম।'

'ও আচ্ছা।'

'এখন আপনাকে একটা অনুরোধ করছি, আপনি দয়া করে বাবার সঙ্গে দেখা করুন। বাবার মন থেকে ভ্রান্ত ধারণা দূর করুন। আজ কি যেতে পারবেন?'

'বুঝতে পারছি না। আজ আমাদের অনেক কাজ।'

'কী কাজ?'

'বাঁদর দেখার জন্যে চিড়িয়াখানায় যেতে হবে। হাতির পিঠে চড়তে। এ জার্নি বাই এলিফ্যান্ট-টাইপ ব্যাপার। আঁখি নামের একটা মেয়েকে খুঁজে বের করতে হবে । ওর সঙ্গে কথা বলতে হবে।'

'বেশ, কাল আসুন।'

• • •

‘দেখি পারি কি না ।’

‘আপনি আমার বাবার অবস্থাটা বুঝতে পারছেন না। একটা ভুল ধারণা তার মনে ঢুকে গেছে। এটা বের করা উচিত।’

আমি হাসিমুখে বললাম, কোনটা ভুল ধারণা, কোনটা শুদ্ধ ধারণা সেটা চট করে বলাও কিন্তু মুশকিল। এই পৃথিবীতে সবকিছুই আপেক্ষিক।

‘আপনি নিশ্চয়ই প্রমাণ করার চেষ্টা করছেন না যে আপনি মানুষ না, অন্যকিছু?’

আমি আবারও হাসলাম। আমার সেই বিখ্যাত বিভ্রান্ত-করা হাসি। তবে বিংশ শতাব্দীর মেয়েরা অনেক চালাক, যত বিভ্রান্তির হাসিই কেউ হাসুক মেয়েরা বিভ্রান্ত হয় না। তা ছাড়া পরিবেশের একটা ব্যাপারও আছে। বিভ্রান্ত হবার জন্যে পরিবেশও লাগে। আমি যদি রাত দুটায় হঠাৎ করে মীরাদের বাসায় উপস্থিত হই এবং এই কথাগুলি বলি কিছুক্ষণের জন্যে হলেও সে বিভ্রান্ত হবে।

এখন ঝলমলে দিনের আলো। আমাদের নাশতা দেয়া হয়েছে। কফি পটভরতি । কফির পট থেকে গরম ধোয়া উড়ছে। এই সময় বিভ্রান্তি থাকে না।

বাদল মাথা নিচু করে বাসি পোলাও খাচ্ছে। মনে হচ্ছে বাসি পোলাও-এর মতো বেহেশতি খানা সে এই জীবনে প্রথম খাচ্ছে।

আমরা চিড়িয়াখানায় গেলাম।

বাঁদরদের বাদাম খাওয়ালাম । তাদের লাফালাফি ঝাঁপাঝাঁপি দেখলাম। তারপর হাতির পিঠে চড়লাম। দশ টাকা করে টিকিট। তারপর গেলাম শিম্পাঞ্জি দেখতে। শিম্পঞ্জি দেখে তেমন মজা পাওয়া গেল না। কারন তাঁর অবস্থা বাদলের মতো। খুবই বিমর্ষ। আমরা একটা কলা ছুড়ে দিলাম- সে ফিরেও তাকাল না। বাঁদরগোত্রীয় প্রাণী অথচ কলার প্রতি আগ্রহ নেই- এই প্রথম দেখলাম। বাদলকে বললাম, চল জিরাফ দেখি ।

বাদল শুকনো গলায় বলল, জিরাফ দেখে কী হবে!

• • •

‘জিরাফের লম্বা গলা দেখে যদি তোর মনটা ভালো হয়।’

‘আমার মন ভালো হবে না। আমি এখন বাসায় চলে যাব।’

‘যা, চলে যা । আমি সন্ধ্যা পর্যন্ত থাকব। সন্ধ্যাবেলা সব পশুপাখি একসঙ্গে ডাকাডাকি শুরু করে- ইন্টারেস্টিং একটা ব্যাপার।’

‘কোনো ইন্টারেস্টিং ব্যাপারে আমি এখন আর আগ্রহ বোধ করছি না।’

‘তা হলে যা, বাড়িতে গিয়ে লম্বা ঘুম দে।’

‘তুমি আঁখিকে টেলিফোন করবে না?’

‘করব।’

‘এখন করো। চিড়িয়াখানায় কার্ডফোন আছে। আমার কাছে কার্ড আছে।

‘তুই কি ফোন-কার্ড সঙ্গে নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছিস? এ-পর্যন্ত ঐ বাড়িতে ক’বার টেলিফোন করেসিস?’

‘দুবার।’

‘তোর সঙ্গে কথা বলেনি?’

‘না।’

‘তোর সঙ্গেই কথা বলেনি, আমার সঙ্গে কি আর বলবে?’

‘তোমার সঙ্গে বলবে- কারণ তুমি হচ্ছ হিমু।’

‘টেলিফোন করে কী বলব?’

বাদল চুপ করে রইল। আমি হাসিমুখে বললাম, তুই নিশ্চয়ই চাস না- কেমন আছ, ভালো আছি-টাইপ কথা বলে রিসিভার রেখে দি? মেয়েটাকে আমি কী বলব সেটা বলে দে।

‘তোমার যা ইচ্ছা তা-ই বলো।’

‘আমি কি বলব- আঁখি শোনো, মগবাজার কাজি অফিস চেন? এক কাজ করো- রিকশা করে কাজি অফিসে চলে আসো। আমি বাদলকে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছি। তুমি এলে তোমাদের বিয়ে দিয়ে দেব। কোনো সমস্যা নেই।’

• • •

বাদল মাথা নিচু করে ফেলল। মনে হচ্ছে সে খুবই লজ্জা পাচ্ছে। প্রায় ফিসফিস করে বলল, তুমি আসতে বললে আঁখি চলে আসবে।

‘তোর তা-ই ধারণা?’

‘হ্যাঁ।’

‘তুই কিন্তু ভালোই বোকা।’

‘আমি বোকা হই যা-ই হই তুমি হচ্ছ হিমু। তুমি যা বলবে তা-ই হবে।’

‘আচ্ছা পরীক্ষা হয়ে যাক-আমি আঁখিকে আস্তে বলি বলব?’

বাদল প্রায় অস্পষ্ট স্বরে বলল, বলো।

বেশ কয়েকবার টেলিফোন করা হলো। ওপাশ থেকে কেউ ফোন ধরছে না। বাদল শুকনোমুখে দাঁড়িয়ে আছে। বাদলকে দেখে খুবই মায়া লাগছে। মায়া লাগলেও কিচ্ছু করার নেই। পৃথিবীতে বেঁচে থাকতে হলে প্রতি পদেপদে মায়াকে তুচ্ছ করতে হয়।

@@

কোনো ভদ্রলোকের যদি বিয়ের দুবছরের মাথায় সন্তানপ্রসবজনিত জটিলতায় স্ত্রীবিয়োগ হয়, তিনি যদি আর বিয়ে না করেন এবং বাকি জীবন কাটিয়ে দেন সন্তানকে বড় করার জটিল কাজে তখন তার ভেতর নানান সমস্যা দেখা দেয়। সমস্যার মূল কারণ অপরাধবোধ। স্ত্রীর মৃত্যুর জন্যে তিনি নিজেকে দায়ী করেন। সন্তানের জন্ম না হলে স্ত্রী মারা যেত না। সন্তানের জন্মের জন্যে তার ভূমিকা আছে এই তথ্য তার মাথায় ঢুকে যায়। মাতৃহারা সন্তানকে মাতৃস্নেহবঞ্চিত করার জন্যেও তিনি নিজেকে দায়ী

করেন। তার নিজের নিঃসঙ্গতার জন্যেও তিনি নিজেকে দায়ী করেন। তিনি সংসারে বেঁচে থাকেন অপরাধীর মতো। যতই দিন যায় তার আচার, আচরণ, জীবনযাপন পদ্ধতি ততই অসংলগ্ন হতে থাকে। স্ত্রী জীবিত অবস্থায় তাকে যতটা ভালোবাসতেন, মৃত্যুর পর তারচে অনেক বেশি ভালোবাসতে শুরু করেন। সেই ভালোবাসাটা চলে যায় অসুস্থ পর্যায়ে।

আশরাফুজ্জামান সাহেবকে দেখে আমার তা-ই মনে হলো । মীরার বাবার নাম আশরাফুজ্জামান। একসময় কলেজে শিক্ষক ছিলেন। স্ত্রীর মৃত্যুর পর চাকরি ছেড়ে দেন। এটাই স্বাভাবিক। অস্থিরতায় আক্রান্ত একটা মানুষ স্থায়ীভাবে কিছু করতে পারে না। বাকি জীবনে তিনি অনেককিছু করার চেষ্টা করেছেন- ইনসিউরেন্স কোম্পানির কাজ, ট্র্যাভেলিং এজেন্সির চাকরি থেকে ইনডেনটিং ব্যবসা, টুকটাক ব্যবসা সবই করা হয়েছে। এখন কিছু করছেন না। পৈতৃক বাড়ি ভাড়া দিয়ে সেই টাকায় সংসার চালাচ্ছেন। সংসারে দুটিমাত্র মানুষ থাকায় তেমন অসুবিধা হচ্ছে না। ভদ্রলোকের প্রচুর অবসর। এই অবসরের সবটাই কাটাচ্ছেন মৃত মানুষের সঙ্গে যোগাযোগের পদ্ধতি উদ্ভাবনে। ভদ্রলোক খুব রোগা। বড় বড় চোখ। চোখের দৃষ্টিতে ভরসা-হারানো ভাব। বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি। এই বয়সে মাথায় কাচাপাকা চুল থাকার কথা। তার মাথার সব চুলই পাকা । ধবধবে সাদা চুলে ভদ্রলোকের মধ্যে ঋষি-ঋষি ভাব চলে এসেছে। তার গলার স্বর খুব মিষ্টি। কথা বলার সময় একটু ঝুঁকে কাছে আসেন। তার হাত খুবই সরু। মৃত মানুষের হাতের মতো— বিবর্ণ। কথা বলার সময় গায়ে হাত দেয়ার অভ্যাসও তার আছে। তিনি যতবারই গায়ে হাত দিয়েছেন, আমি ততবারই চমকে উঠেছি।

'আপনার নাম হিমু?'

'জি ।'

'মানিব্যাগ নিয়ে রাতে আপনি যখন এসেছিলেন তখন আপনার চেহারা একরকম ছিল— এখন অন্যরকম।'

• • •

আমি বললাম, তাজমহল দিনের একেক আলোয় একেক রকম দেখা যায়— মানুষ তো তাজমহলের চেয়েও অনেক উন্নত শিল্পকর্ম, মানুষের চেহারাও বদলানোার কথা।

'আমার ধারণা ছিল, আপনি মানুষ না।'

'এখন কী ধারণা, আমি মানুষ?'

আশরাফুজ্জামান সাহেব সরুচোখে তাকিয়ে রইলেন। তাঁর চোখমুখে একধরনের অস্বস্তি। মনে হচ্ছে তিনি আমার ব্যা ব্যাপারে এখনও সংশয়মুক্ত না। আমি হাসিমুখে বললাম, একদিন দিনের বেলা এসে আপনাকে দেখাব- রোদে দাঁড়ালে আমার ছায়া পড়ে।

আশরাফুজ্জামান সাহেব নিচুগলায় বললেন, মানুষ না, কিন্তু মানুষের মতো জীবদেরও ছায়া পড়ে।

'তা-ই নাকি?'

'জি। এরা মানুষদের মধ্যেই বাস করে।'

'ও আচ্ছা।'

'আমি অনেককিছু জানি, কিন্তু কাউকে মন খুলে বলতে পারি না। কেউ আমার কথা বিশ্বাস করবে না- পাগল ভাববে। মীরাকেও আমি তেমনকিছু বলি না।'

'আমাকে বলতে চাচ্ছেন?'

'জি না।'

'বলতে চাইলে বলতে পারেন।'

'আচ্ছা, আমাকে দেখে কি আপনার মনে হয় আমি অসুস্থ?'

'না, তা মনে হচ্ছে না।'

'মীরার ধারনা আমি অসুস্থ । যতই দিন যাচ্ছে ততই তার ধারণা প্রবল হচ্ছে। অথচ আমি জানি আমি খুবই সুস্থ-স্বাভাবিক মানুষ। আমার অস্বাভাবিকতা বলতে এইটুকু যে মীরার মা'র সঙ্গে আমার দেখা হয়, কথাবার্তা হয়।

'তা-ই বুঝি?'

• • •

'জি। মানিব্যাগ হারিয়ে গেল। আমি খুবই আপসেট হয়ে বাসায় এসেছি। আমি মোটামুটিভাবে দরিদ্র মানুষ- এতগুলি টাকা! মীরাকে খবরটা দিয়ে নিজের ঘরে দরজা বন্ধ করে বসে আছি- তখন মীরার মা'র সঙ্গে আমার কথা হলো। সে বলল, তুমি মনখারাপ কোরো না, টাকা আজ রাতেই ফেরত পাবে। আমি মীরাকে বললাম, সে হেসেই উড়িয়ে দিল ।

'হেসে উড়িয়ে দেয়াটা ঠিক হয়নি। টাকা তো সেই রাতেই ফেরত পেয়েছিলেন। তা-ই না?'

'জি। মীরার মা সারাজীবন আমাকে নানাভাবে সাহায্য করেছে। এখনও করছে?'

'ওনার নাম কী?'

'ইয়াসমিন।'

'উনি কি সরাসরি আপনার সঙ্গে কথা বলেন, না প্ল্যানচেটের মাধ্যমে তাকে আনতে হয় ।'

তিনি নিচুগলায় বললেন শুরুতে প্লানচেট আনতাম। এখন নিজেই আসে। যা বলার সরাসরি বলে।'

'তাকে চোখে দেখতে পান?'

'সবসময় পাইনা- হঠাৎ হঠাৎ দেখা পাই। আপনি বোধহয় আমার কোনো কথা বিশ্বাস করছেন না। অবিশ্বাসের একটা হাসি আপনার ঠোটে।'

'আমি আপনার সব কথাই বিশ্বাস করছি। আমি তো মিসির আলি না যে সব কথা অবিশ্বাস করব। আমি হচ্ছি হিমু। হিমুর মূলমন্ত্র হচ্ছে বিশ্বাসে মিলায় বস্তু, তর্কে বহুদূর।'

'মিসির আলি কে?'

'আছেন একজন। তার মূলমন্ত্র হচ্ছে তর্কে মিলায় বস্তু, বিশ্বাসে বহুদূর । তার ধারণা— জীবনটা অঙ্কের মতো। একের সঙ্গে এক যোগ করলে সবসময় দুই হবে। কখনো তিন হবে না ।'

'তিন কি হয়?'

• • •

'অবশ্যই হয়- আপনার বেলায় তো হয়ে গেল। আপনি এবং মীরা- এক এক দুই হবার কথা। আপনার বেলায় হচ্ছে তিন । মীরার মা কোথেকে যেন উপস্থিত হচ্ছেন।'

'আপনি তো বেশ গুছিয়ে কথা বলেন । চা খাবেন?'

'চা কে বানাবে, মীরা তো বাসায় নেই।'

'চা আমিই বানাব। ঘর-সংসারের কাজ সব আমিই করি। চা বানানো, রান্না- সব করতে পারি। মোগলাই ডিশও পারি।'

'আপনার কোনো কাজের লোক নেই?'

'না।'

'নেই কেন? মীরার মা পছন্দ করেন না?'

'জি না। আপনি ঠিক ধরেছেন।'

'কোনো কাজের মানুষের সাহায্য ছাড়া মেয়েকে বড় করতে আপনার কোনো সমস্যা হয়নি?'

'সমস্যা তো হয়েছেই। তবে ইয়াসমিন আমাকে সাহায্য করেছে। যেমন ধরুন মেয়ে রাতে কাথা ভিজিয়ে ফেলেছে। আমি কিছু বুঝতে পারছি না, ঘুমে অচেতন। ইয়াসমিন আমাকে ডেকে তুলে বলবে- মেয়ে ভেজা কাথায় শুয়ে আছে।'

'বাহ, ভালো তো।'

'মীরার একবার খুব অসুখ হলো। কিছু খেতে পারে না, যা খায় বমি করে ফেলে দেয়- শরীরে প্রবল জ্বর। ডাক্তাররা কড়া কড়া অ্যান্টিবায়োটিক দিচ্ছেন, জ্বর সারছে না। তখন ইয়াসমিন এসে বলল, তুমি মেয়েকে অষুধ খাওয়ানো বন্ধ করো। কাগজিলেবুর শরবত ছাড়া কিছু খাওয়াবে না।'

'আপনি তা-ই করলেন?'

'প্রথম দিকে করতে চাইনি ভরসা পাচ্ছিলাম না- কারণ মেয়ের অবস্থা খুব খারাপ। তাকে স্যালাইন দেয়া হচ্ছে। এরকম একজন রোগীর অষুধপত্র বন্ধ করে দেয়াটা কঠিন কাজ ।'

• • •

‘অর্থাৎ আপনি আপনার স্ত্রীর কথা পুরোপুরি বিশ্বাস করেননি?’

‘জি করেছি কিন্তু সাহস হচ্ছিল না। মেয়ের অবস্থা আরও যখন খারাপ হলো তখন প্রায় মরিয়া হয়েই ওষুধপত্র বন্ধ করে লেবুর শরবত খাওয়াতে শুরু করলাম। দুদিনের মাথায় মেয়ে পুরোপুরি সুস্থ হয়ে গেল।’

‘এরকম ভূত-ডাক্তার ঘরে থাকাতো খুব ভালো।’

‘দয়া করে আমার স্ত্রীকে নিয়ে কোনো রসিকতা করবেন না। আমি এমিতেই রসিকতা পছন্দ করি না। স্ত্রীকে নিয়ে রসিকতা একেবারেই পছন্দ করি না। চা খাবেন কি না তা তো বলেননি।’

‘চা খাব।’

আশরাফুজ্জামান সাহেব চা আনতে গেলেন। সন্ধ্যা সাতটার মতো বাজে। পুরো রাত আমার সামনে পড়ে আছে। আশরাফুজ্জামান সাহেব চা বানাতে থাকুন, আর আমি বসে বসে গুছিয়ে ফেলি রাতে কী কী করব। অনেকগুলি কাজ জমে আছে।

ক) আখি নামের মেয়েটার সঙ্গে যোগাযোগ হয়নি। যোগাযোগ করতে হবে। টেলিফোন করলেই ওপাশ থেকে পোঁ-পোঁ শব্দ হয়। বাদল কি টেলিফোন নাম্বার ভুল এনেছে?

খ) বড় ফুপু জরুরি খবর পাঠিয়েছেন। আমার মনে হয় আঁখিসংক্রান্ত বিষয়েই আলাপ করতে চান ।

গ) এক পীরের সন্ধান পাওয়া গেছে— নাম ময়লা-বাবা । সারা গায়ে ময়লা মেখে বসে থাকেন। তার সঙ্গে একটু দেখা করা দরকার।

ঘ) মিসির আলি সাহেবের ঠিকানা পাওয়া গেছে। ভদ্রলোকের সঙ্গে কথা বলার ইচ্ছা। উনি কথা বলবেন কি না কে জানে! যুক্তিসঙ্গত কারণ উপস্থিত না করলে উনি কথা বলবেন বলে মনে হয় না। এই ধরনের মানুষরা যুক্তির বাইরে পা দেন না। তারা জানেন অ্যান্টিলজিক হচ্ছে লজিকেরই উলটো পিঠ ।

‘হিমু সাহেব!’

• • •

‘জি?’

‘আপনার চা নিন। চায়ে আপনি ক’চামচ চিনি খান?’

‘যে যত চামচ দেয় তত চামচই খাই। আমার কোনোকিছুতেই কোনো ধরাবাধা নিয়ম নেই।’

‘আমি এক চামচ চিনি দিয়েছি।’

‘খুব ভালো করেছেন। এবং চা অসাধারণ হয়েছে— গরম মশল্লা দিয়েছেন নাকি?’

সামান্য দিয়েছি- এক দানা এলাচ, এক চিমটি জাফরান। ফ্লেভারের জন্যে দেয়া।’

‘খুব ভালো করেছেন।’

‘আমার স্ত্রী চা নিয়ে অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করত। কমলালেবুর খোসা শুকিয়ে রেখে দিত। মাঝে মাঝে চায়ে সামান্য কমলালেবুর খোসা দিয়ে দিত। অসাধারণ টেষ্ট । কমলালেবুর শুকানো খোসা আমার কাছে আছে, একদিন আপনাকে খাওয়াব।’

‘জি আচ্ছ। একটা কথা-আপনার স্ত্রী কি এই বাড়িতেই থাকেন, মানে ভূত হবার পর আপনার সঙ্গেই আছেন ?’

‘ইয়াসমিন প্রসঙ্গে ভূত-প্রেত এই জাতীয় শব্দ দয়া করে ব্যবহার করবেন না।’

‘জি আচ্ছ, করব না। উনি কি এখন আশেপাশেই আছেন?’

‘হ্যাঁ।’

‘তার উপস্থিতি আপনি বুঝতে পারেন?’

‘পারি।’

‘আমি কি তার সঙ্গে কথা বলতে পারি?’

‘আপনি কথা বললে সে শুনবে । সে আপনার সঙ্গে কথা বলবে কি না তা তো জানি না! । সে মীরার সঙ্গেই কথা বলে না । মীরা তার নিজের মেয়ে।’

‘আমি আপনার স্ত্রীকে কিছু কথা বলতে চাচ্ছিলাম। কীভাবে বলব? বাতি নিভিয়ে বলতে হবে?’

‘বাতি নেভাতে হবে না। যা বলার বলুন, সে শুনবে।’

• • •

‘সম্বোধন করব কী বলে? ভাবি ডাকব?’

‘হিমু সাহেব, আপনি পুরো ব্যাপারটা খুব হালকাভাবে নেবার চেষ্টা করছেন। এটা ঠিক না। আমার স্ত্রীকে আপনার যদি কিছু জিজ্ঞেস করার থাকে জিজ্ঞেস করুন। আমি তার কাছ থেকে জবাব এনে দিচ্ছি।’

‘চা শেষ করে নিই। চা খেতে খেতে যদি ওনার সঙ্গে কথা বলি, উনি হয়তো এটাকে বেয়াদবি হিসেবে নেবেন।’

‘আবারও রসিকতা করছেন?’

‘আর করব না।’

আমি চায়ে শেষ চুমুক দিয়ে ঘরের ছাদের দিকে তাকিয়ে গম্ভীর গলায় বললাম, আমার ভালো নাম হিমালয়। ডাকনাম হিমু। সবাই এখন আমাকে এই নামে চেনে। আমাকে বলা হয়েছে মীরার মৃতা মা এই বাড়িতে উপস্থিত আছেন। আমি এর আগে কোনো মৃত মানুষের সঙ্গে কথা বলিনি। আমি জানি না তাদের সঙ্গে কীভাবে কথা বলতে হয়। আমার কথাবার্তায় যদি কোনো বেয়াদবি প্রকাশ পায়- দয়া করে ক্ষমা করে দেবেন। আমি আপনার কাছ থেকে একটা ব্যাপার জানতে চাচ্ছি। আমি একরাতে প্রচণ্ড ভয় পেয়েছিলাম। কী দেখে ভয় পেয়েছিলাম সেটা কি আপনি বলতে পারবেন?

কথা শেষ করে মিনিট পাঁচেক চুপচাপ বসে রইলাম। আশরাফুজ্জামান সাহেবও চুপচাপ বসে আছেন। তার চোখ বন্ধ। মনে হয় তিনি ঘুমিয়ে পড়েছেন। ঘুমন্ত মানুষের মতো তিনি ধীরে ধীরে শ্বাস ফেলছেন। তার ঘুম ভাঙাবার জন্য আমি শব্দ করে কাশলাম। তিনি চোখ মেললেন না, তবে নড়েচড়ে বসলেন । আমি বললাম, উনি কি আমার কথা শুনতে পেয়েছেন?

‘পেয়েছে।’

‘উত্তরে কী বললেন?’

‘সে এই প্রসঙ্গে কিছু বলতে চায় না।’

‘আমি আজ বিদায় নিচ্ছি। মীরকে বলে আমি এসেছিলাম।’

• • •

‘আরেকটু বসুন, মীরা চলে আসবে। তার বান্ধবীর জন্মদিনে গিয়েছে। বলে গেছে আটটার মধ্যে চলে আসবে । আটটা বাজতে আর মাত্র পাঁচ মিনিট।’

আমি উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বললাম, আজ মীরা আসতে অনেক দেরি করবে- বারোটা-একটা বেজে পারে। কাজেই অপেক্ষা করা অর্থহীন।

আশরাফুজ্জামান সাহেব ভুরু কুঁচকে তীক্ষ্ণ গলায় বললেন, দেরি করবে বলছেন কেন?

‘আমার মনে হচ্ছে দেরি হবে। একধরনের ইনটিউশন। আমার ইনটিউশন ক্ষমতা প্রবল।’

ভদ্রলোক অবিশ্বাসীর দৃষ্টিতে তাকাচ্ছেন। আমি বললাম, আপনি ওভাবে তাকাচ্ছেন কেন? আপনি যা বলেছেন আমি বিশ্বাস করেছি। আমার কথা আপনি বিশ্বাস করছেন না কেন?

‘মীরা কখনো রাত আটটার পর বাইরে থাকে না । আমার এখানে টেলিফোন নেই। দেরি হলে টেলিফোনে খবর দিয়ে সে আমার দুশ্চিন্তা দূর করতে পারবে না বলেই কখনো দেরি করবে না। আপনি আটটা পর্যন্ত অপেক্ষা করে দেখুন। কমলালেবুর খোসা দিয়ে এক কাপ চা বানিয়ে দি, খেয়ে দেখুন।’

‘অন্য সময় এসে খেয়ে যাব। আমার খুব কিছু জরুরি কাজ আছে, আজ রাতের মধ্যেই সারতে হবে।’

আমি রাস্তায় নামলাম ।

প্রথমে যাব বড় ফুপুর কাছে। ছেলের বিয়েভাঙার শোক তিনি সামলে উঠেছে কি না কে জানে। মেয়ের বিয়েভাঙার শোক সামলানো যায় না, ছেলের বিয়েভাঙার শোক ক্ষণস্থায়ী হয়। এইসব ক্ষেত্রে ছেলের মা একটু বোধহয় খুশিও হন— ছেলে আর কিছুদিন রইল তার ডানার নিচে । ছেলের বিয়ে নিয়ে এত ভাবারও কিছু নেই। মেয়েদের বিয়ের বয়স পার হয়ে যায়। ছেলেদের বিয়ের বয়স পার হয় না।

• • •

৯

বড় ফুপু বিছানায় লম্বা হয়ে শুয়ে আছেন। তার মাথার নিচে অয়েলক্লথ। তার মাথায় পানি ঢালা হচ্ছে। বিভ্রান্ত হবার মতো কোনো দৃশ্য না। যারা বড় ফুপুর সঙ্গে পরিচিত তারা জানে, মাথায় পানি ঢালা তার হবিবিশেষ। তিনি খুব আপসেট, মাথায় পানি ঢেলে তাকে ঠিক করা হচ্ছে এটা তিনি মাঝেমধ্যেই প্রমাণ করতে চান। আমি ঘরে ঢুকেই বললাম, ফুপু, কী খবর?

ফুপু ক্ষীণস্বরে বললেন, কে?

এটাও তার অভিনয়ের একটা অংশ। তিনি বোঝাতে চাচ্ছেন যে তার অবস্থা এতই খারাপ যে তিনি আমাকে চিনতে পারছেন না।

'মাথায় পানি ঢালা হচ্ছে, ব্যাপার কী ফুপু?'

'তুই কিছু জানিস না? আমাদের সবার কাপড় তো খুলে ন্যাংটা করে ছেড়ে দিয়েছে!'

'কে?'

'বাদলের শ্বশুরবাড়ির লোকজন। রাত এগারোটা পর্যন্ত বসিয়ে রেখে মেয়ে দেয়নি।'

'ও, এই ব্যাপার!'

বড় ফুপু ঝপাং করে উঠে বসলেন। যে পানি ঢালছিল তার হাতের এইম নষ্ট হওয়ায় পানি চারদিকে ছড়িয়ে গেল। বড় ফুপু হুংকার দিয়ে বললেন, এটা সামান্য ব্যাপার? তোর কাছে এটা সামান্য ব্যাপার?

'ব্যাপার খুবই গুরুতর। মেয়ে মা'র সঙ্গে রাগ করে বান্ধবীর বাড়ি চলে গেছে, এখন করা যাবে কী? আজকালকার মেয়ে, এরা কথায়-কথায় মা'দের সঙ্গে রাগ করে।'

'মেয়ে রাগ করে বান্ধবীর বাড়ি চলে গেছে এই গাঁজাখুরি গল্প তুই বিশ্বাস করতে বলিস? তুই ঘাস খাস বলে আমিও ঘাস খাই! মেয়েকে ওরাই লুকিয়ে রেখেছে?'

'তা-ই নাকি?'

'অবশ্যই তা-ই।'

'শুধু শুধু লুকিয়ে রাখবে কেন?'

'সেটা তুই জেনে দে।'

• • •

‘আমি কীভাবে জানব?’

‘তুই ওদের বাসায় যাবি। মেয়ের সঙ্গে কথা বলবি, ব্যাপার কী সব জেনে আসবি । মেয়ের বাবাকে বলবি ঝেড়ে কাশতে । আমি সব জানতে চাই।’

‘জেনে লাভ কী?’

‘লাভ আছে। আমি ওদের এমন শিক্ষা দেব যে তিন জন্মে ভুলবে না।’

‘শিক্ষা দিয়ে কী হবে, তুমি তো আর স্কুল খুলে বসনি।’

‘তোর গা-জ্বালা কথা আমার সঙ্গে বলবি না। তোকে যা করতে বলছি করবি । এক্ষুনি চলে যা।’

‘ওদের গোপন কথা ওরা আমাকেই-বা শুধু শুধু বলবে কেন?’

‘তুই ভুজুংভাজুং দিয়ে মানুষকে ভোলাতে পারিস। ওদের কাছ থেকে খবর বের করে আন, তারপর দেখ আমি কী করি।’

‘করবেটা কী?’

‘মানহানির মামলা করব । আমি সাদেককে বলে দিয়েছি- এর মধ্যে মনে হয় করা হয়েও গেছে। মেয়ের বাপ আর মামাটাকে জেলে ঢোকাব। তার আগে আমার সামনে এসে দুজনে দাঁড়াবে। কানে ধরে দশবার উঠবোস করবে।’

‘তোমার বেয়াই তোমার সামনে কানে ধরে উঠবোস করবে এটা কি ঠিক হবে? বিবাহ-সম্পর্কিত আত্মীয় অনেক বড় আত্মীয়।’

‘তারা আমার আত্মীয় হলো কখন?’

‘হয়নি, হবে।’

‘হিমু, তুই কি আমার সঙ্গে ফাজলামি করছিস?’

‘না, ফাজলামি করছি না- কোনো-একটা সমস্যায় বিয়ে হয়নি, সেই সমস্যার সমাধান হয়ে গেলে বিয়ে হতে আপত্তি কী? তা ছাড়া—’

‘তা ছাড়া কী?’

‘বাদলের মন ঐ মেয়ের কাছে পড়ে আছে।’

• • •

'বাদলের মন ঐ মেয়ের কাছে, কী বলছিস তুই! যে-মেয়ে লাথি দিয়ে তাকে নর্দমায় ফেলে দিল, যে তাকে ন্যাংটো করে দিল এতমানুষের সামনে, তার কাছে-'

'যা পাওয়া যায় না তার প্রতি আকর্ষণ বেড়ে যায়।'

'বাদল যদি কোনোদিন ঐ মেয়ের নাম মুখে আনে তাকে আমি জুতাপেটা করব। জুতিয়ে আমি তার রস নামিয়ে দেব।'

'জুতাপেটা করেও লাভ হবে না ফুপু। আমি বরং দেখি জোড়াতালি দিয়ে কিছু করা যায় কি না । বাদল আঁখির টেলিফোন নাম্বার দিয়েছে- যোগাযোগ করে দেখি।'

'বাদল তোকে ঐ মেয়ের টেলিফোন নাম্বার দিয়েছে?'

'হ্যাঁ।'

'দুধকলা দিয়ে আমি তো দেখি কালসাপ পুষেছি!'

'তা-ই তো মনে হচ্ছে। যে-মেয়ে তোমাদের সবাইকে ন্যাংটো করে ছেড়ে দিয়ে মজা দেখছে তার জন্যে এত ব্যাকুলতা! তার টেলিফোন নাম্বার নিয়ে ছোটাছুটি।'

বড় ফুপুর রাগ চরমে উঠে গিয়েছিল। তিনি বড় বড় কয়েকটা নিশ্বাস নিয়ে রাগ সামলালেন । থমথমে গলায় বললেন, হিমু শোন। বাদল যদি এ মেয়ের কথা মুখে আনে তাকে আমরা ত্যাজ্যপুত্র করব। এই কথাটা তাকে তুই বলবি।'

'এক্ষুনি বলছি।'

'বাদল বাসায় নেই, কোথায় যেন গেছে। তুই বসে থাক, বাদলের সঙ্গে কথা না বলে যাবি না।'

'আচ্ছা যাব না। বাদল গেছে কোথায়?'

'জানি না।'

'আঁখিদের বাসায় চলে যায়নি তো?'

বড় ফুপু রক্তচক্ষু করে তাকাচ্ছেন। এইবার বোধহয় তার ব্লাডপ্রেসার সত্যি সত্যি চড়েছে। অকারণে মানুষের চোখ এমন লাল হয় না।

• • •

'ফুপু তুমি শুয়ে থাকো। তোমার মাথায় পানিটানি দেয়া হোক। আমি বাদলের সঙ্গে কথা না বলে যাচ্ছি না। ফুপা কোথায়?'

'আর কোথায়, ছাদে।'

আমি ছাদের দিকে রওনা হলাম। আজ বুধবার— ফুপার মদ্যপান-দিবস। তার ছাদে থাকারই কথা। ফুপু অয়েলক্লথে মাথা রেখে আবার শুয়েছেন। বিপুল উৎসাহে তার মাথায় পানি ঢালা হচ্ছে।

ফুপা ছাদেই আছেন।

তাকে যেন আনন্দিত বলেই মনে হলো। জিনিস মনে হয় পেটে পড়েছে। এবং ভালো ডোজেই পড়েছে। তাঁর চোখেমুখে উদাস এবং শান্তি-শান্তি ভাব।

'কে, হিমু?'

'জি।'

'আছিস কেমন হিমু?'

'জি ভালো।'

'কেমন ভালো— বেশি, কম, না মিডিয়াম?'

'মিডিয়াম ।'

'আমার মনটা খুবই খারাপ হিমু।'

'কেন।'

'বাদলের বিয়েতে তো তুই যাসনি। বিরাট অপমানের হাত থেকে বেঁচে গেছিস । তারা বিয়ে দেয়নি। মেয়ে নিয়ে লুকিয়ে ফেলেছে।'

'বলেন কী?'

'বানোয়াট গল্প ফেঁদেছে। মেয়ে নাকি রাগ করে বান্ধবীর বাড়ি চলে গেছে। এটা কি বিশ্বাসযোগ্য কথা? যার বিয়ে সে রাগ করে বান্ধবীর বাড়ি যাবে।'

'আজকালকার ছেলেমেয়ে, এদের সম্পর্কে কিছুই বলা যায় না।'

• • •

'এটা তুই অবিশ্যি ঠিক বলেছিস । আমাদের সময় আর বর্তমান সময় এক না। সোসাইটি চেঞ্জ হচ্ছে। ঘরে-ঘরে এখন ভিসিআর, ডিশ অ্যান্টেনা । এইসব দেখেশুনে ইয়াং ছেলেমেয়েরা নানান ধরনের ড্রামা করা শিখে যাচ্ছে। বিয়ের দিন রাগ করে বান্ধবীর বাড়ি চলে যাওয়া সেই ড্রামারই একটা অংশ। ভালো বলেছিস হিমু। well said.এখন মনে হচ্ছে মেয়েটা আসলেই রাগ করে বান্ধবীর বাড়িতে গেছে।'

'ছেলের বিয়ে হয়নি বলে আপনারা লজ্জার মধ্যে পড়েছেন । ওদের লজ্জা তো আরও বেশি । মেয়ের বিয়ে হলো না।'

'অবশ্যই, অবশ্যই। ভাগ্যিস মুসলমান পরিবারের মেয়ে! হিন্দু মেয়ে হলে তো দুপড়া হয়ে যেত! এই মেয়ের আর বিয়েই হতো না। হিমু, ছেলেরা হচ্ছে হাসের মতো, গায়ে পানি লাগে না। আর মেয়েরা হচ্ছে মুরগির মতো, এককোঁটা পানিও ওদের গায়ে লেপটে যায়। আঁখি মেয়েটার জন্যে খুবই মায়া হচ্ছে হিমু।'

'মায়া হওয়াই স্বাভাবিক।'

'ঐদিন অবিশ্যি খুবই রাগ করেছিলাম। ভেবেছিলাম মানহানির মামলা করব।'

'আপনার মতো মানুষ মানহানির মামলা কীভাবে করে! আপনি তো গ্রামের মামলাবাজ মোড়ল না। আপনি হচ্ছেন হৃদয়বান একজন মানুষ।'

'ভালো কথা বলেছিস হিমু। হৃদয়বান কথাটা খুব খাঁটি বলেছিস। গাড়ি করে যখন আমি শেরাটন হোটেলের কাছে ফুলওয়ালি মেয়েগুলি ফুল নিয়ে আসে ধমক দিতে পারি না। কিনে ফেলি। ফুল নিয়ে আমি করব কী বল। তোর ফুপুকে যদি দিই সে রেগে যাবে, ভাববে আমার ব্রেইন ডিফেক্ট হয়েছে। কাজেই নর্দমায় ফেলে দি। একবার তোর ফুপুকে ফুল দিয়েছিলাম। সে বিরক্ত হয়ে বলেছিল, ঢং কর কেন?'

'তা-ই নাকি?'

'এইসব দুঃখের কথা বলে কী হবে! বাদ দে।'

'জি আচ্ছা, বাদ দিচ্ছি।'

'তোর দুই বন্ধু এখনও আসছে না কেন বল তো?'

• • •

আমি বিস্মিত হয়ে বললাম, ওদের কি আসার কথা নাকি?

'আসার কথা তো বটেই। ওদের আমার খুব পছন্দ হয়েছে। প্রতি বুধবারে আসতে বলেছি। ভেরি গুড কোম্পানি। ওরা যে আমাকে কী পরিমাণ শ্রদ্ধা করে সেটা না দেখলে কেউ বিশ্বাস করবে না।'

'ফুপু বলছিলেন ওরা নাকি ন্যাংটা হয়ে ছাদে নাচানাচি করছিল।'

ফুপা গ্লাসে একটা লম্বা টান দিয়ে বললেন, তোর ফুপু বিন্দুতে সিন্ধু দেখে- কাশির শব্দ শুনে ভাবে যক্ষ্মা। ঐ রাতে কিছুই হয়নি। বেচারাদের গরম লাগছিল- আমি বললাম, শার্ট খুলে ফ্যালো। গরমে কষ্ট করার মানে কী! ওরা শার্ট খুলেছে। আমিও খুলছি, ব্যস?

'ও আচ্ছা।'

'হিমু, তোর বন্ধু দুজন দেরি করছে কেন? এইসব জিনিস একা একা খাওয়া যায় না। খেতে খেতে মন খুলে কথা না বললে ভালো লাগে না। দুধ একা খাওয়া যায়, কিন্তু ড্রিংকসে বন্ধুবান্ধব লাগে।'

'আসতে যখন বলেছেন অবশ্যই আসবে।'

'তুই বরং এক কাজ কর, ঘরের বাইরের রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাক। ওরা হয়তো বাসার সামনে দিয়ে ঘোরাঘুরি করছে। বাসা চিনতে পারছে না বলে ঢুকতে পারছে না। গেট দিয়ে সোজা ছাদে নিয়ে আসবি । তোর ফুপুর জানার দরকার নেই। দুটো নিতান্তই গোবেচারা ভদ্র ছেলে- অথচ তোর ফুপু ওদের বিষদৃষ্টিতে দেখেছে। I don't know why শাস্ত্রে বলে না, নারী চরিত্র দেবা না জানন্তি কুতা মনুষ্যা- ঐ ব্যাপার আর কি হিমু-Young friend. রাস্তায় গিয়ে ওদের জন্যে একটু দাঁড়া ।

'জি আচ্ছা।'

আমি নিচে নেমে দেখি ফুপুর মাথায় পানি ঢালাঢালি শেষ হয়েছে। তিনি গম্ভীরমুখে বসে আছে। আমি দরজা খুলে রাস্তায় চুপিচুপি নেমে যাব। ফুপু গভীর গলায় বললেন, এই হিমু, শুনে যা । আমি পরিচয় করিয়ে দি, এ হচ্ছে সাদেক । হাইকোর্টে প্র্যাকটিস করে। আমার দূর সম্পর্কের ভাই হয়। ভয়ংকর কাজের ছেলে। মানহানির মামলা ঠুকতে

• • •

বলেছিলাম, এখন মামলা সাজিয়েছে। কাল মামলা দায়ের করা হবে, তারপর দেখবি কত গমে কত আটা। সাদেক, তুমি হিমুকে মামলার ব্যাপারটা বলো।

সাদেক বিরক্তমুখে বললেন, ওনাকে শুনিয়ে কী হবে?

'আহা, শোনাও-না! হিমু আমাদের নিজেদের লোক। মামলাটা কী সাজানো হয়েছে সে শুনুক, কোনো সাজেশন থাকলে দিক। এই হিমু, বসে ভালো করে শোন। সাদেক তুমি গুছিয়ে বলো।'

সাদেক সাহেব গম্ভীর গলায় বললেন, শুধু মানহানি মামলা তো তেমন জোরলো হয় না। সাথে আরও কিছু অ্যাড করেছি।

আমি কৌতুহলী হয়ে বললাম,কী অ্যাড করেছেন?

সাদেক সাহেব ভারি গলায় বললেন, অ্যাড করেছি- কনেপক্ষ ভাড়াটে গুণ্ডার সহায়তায় কোনোরকম পূর্বউসকানি ছাড়া ধারালো অস্ত্রশস্ত্র, যেমন লোহার রড, কিরিচসহ বরযাত্রীদের উপর আচমকা চড়াও হয়। বরযাত্রীদের দ্রব্যসামগ্রী, যেমন মানিব্যাগ, রিস্টওয়াচ লুণ্ঠন করে। মহিলাদের শারীরিকভাবে লাঞ্ছিত করে। পূর্বপরিকল্পিত এই আক্রমণে বরসহ তিনজন গুরুতর আহত হয়। তাহারা বর্তমানে চিকিৎসাধীন আছে। বরযাত্রীদের দুটি গাড়িরও প্রভূত ক্ষতিসাধন করা হয়। একটি গাড়িতে অগ্নিসংযোগ করা হয়। এই আর কি! সব ডিটেল দেয়া হবে।

আমি হতভম্ব হয়ে বললাম, বলেন কী!

সাদেক সাহেব তৃপ্তির হাসি হেসে বললেন, সাজানো মামলা অরিজিনালের চেয়েও কঠিন হয়। অরিজিনাল মামলায় আসামি প্রায়ই খালাস পেয়ে যায়। সাজানো মামলায় কখনো পায় না। কথা হলো এভিডেন্স ঠিকমতো প্লেস করতে হবে।

'এভিডেন্স পাবেন কোথায়?'

'বাংলাদেশে এভিডেন্স কোনো সমস্যা না। মার খেয়ে পা ভেঙেছে চান? পা-ভাঙা লোক পাবেন। X-Ray রিপোর্ট পাবেন। রেডিওলজিস্টের সার্টিফিকেট পাবেন। টাকা খরচ করলে দুনম্বরি জিনিস সবই পাওয়া যায়।'

• • •

বড় ফুপ বললেন, টাকা আমি খরচ করব। জোঁকের মুখে আমি নুন ছেড়ে দেব। সাদেক মামলা শক্ত করার জন্য তোমার যা যা করা লাগে করো। দরকার হলে আমি আমার গাড়ি আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দিয়ে বলব ওরা পুড়িয়ে দিয়েছে।

‘তা লাগবে না। পুরানো গাড়ির দোকান থেকে ভাঙা একটা গাড়ি এনে আগুন লাগিয়ে দিলেই হবে। তবে গাড়ির ব্লু বুক লাগবে। এটা অবিশ্যি কোনো ব্যাপার না।’

ফুপু তৃপ্তির নিশ্বাস ফেলে বললেন, তুমি থাকায় ভরসা পচ্ছি। ওদের আমি তুর্কি নাচন নাচিয়ে ছাড়ব ।

সাদেক সাহেব বললেন, বাদলকে একটু দরকার। ওকে ব্যাক ডেট দিয়ে একটা ভাল ক্লিনিকে ভরতি করিয়ে দিতে হবে। মার খাবার পর মাথায় আঘাত পেয়ে আন্ডার অবজারভেশনে আছে এটা প্রমাণ করার জন্যে দরকার। কিছু এক্সরে-টেক্সরে করা দরকার ।

ফুপু উজ্জ্বলমুখে বললেন, তুমি অপেক্ষা করো। বাদল আসুক। আজই তাকে ক্লিনিকে ভরতি করিয়ে দেব। মাছ দেখেছে বড়শি দেখেনি।

ফুপু প্রবল উৎসাহে মামলার সূক্ষ্ম বিষয় নিয়ে সাদেক সাহেবের সঙ্গে কথা বলতে লাগলেন। আমি “নাকটা ঝেড়ে আসি ফুপু” বলে বের হয়ে লম্বা লম্বা পা ফেলে উধাও হলাম। সাদেক সাহেব ভয়াবহ ব্যক্তি! আমি উপস্থিত থাকলে পা-ভাঙা ফারিয়াদি হিসেবে আমাকেও হাসপাতালে ভরতি করিয়ে দিতে পারে। মামলা আরও পোক্ত করার জন্যে মুগুর দিয়ে পা ভেঙে ফেলাও বিচিত্র না।

পথে নেমেই মোফাজ্জল এবং জহিরুলের সঙ্গে দেখা। ওরা ঘোরাঘুরি করছে। আমাকে দেখে অকূলে কূল পাওয়ার মতো ছুটে এল- হিমু ভাইয়া না?

‘হু।’

‘স্যারের বাসাটা ভুলে গেছি। স্যার আসতে বলেছিলেন।’

‘এই বাড়ি। বাড়ির ভেতরে ঢুকবেন না। গেট দিয়ে সোজা ছাদে চলে যান।’

‘স্যারের শরীর কেমন হিমু ভাইয়া?’

• • •

'শরীর ভাল।'

'ফেরেশতার মতো আদমি। ওনার মতো মানুষ হয় না। সারের জন্যে একটা পাঞ্জাবি এনেছি।'

'খুব ভালো করেছেন। দাড়িয়ে থেকে সময় নষ্ট করবেন না। চলে যান।'

তারা গেটের ভেতর ঢুকে পড়ল।

রাত দশটার মতো বাজে। মীরাদের বাড়িতে একবার উকি দিয়ে যাব কিনা ভাবছি। মীরা ফিরেছে কিনা দেখে যাওয়া দরকার ।

মীরার বাবা ঘরের বাইরে বারান্দায় বসে আছেন। আমাকে দেখে উঠে এলেন। আমি বললাম, মীরা এখনও ফেরেনি?

তিনি হাহাকার-মেশানো গলায় বললেন, জি না ।

'চিন্তা করবেন না, চলে আসবে। এখন মাত্র দশটা চল্লিশ । বারোটা-সাড়ে বারোটার দিকে চলে আসবে।'

ভদ্রলোক অদ্ভুত চোখে তাকাচ্ছেন। তিনি এখন পুরোপরি বিভ্রান্ত। আমি আবারও পথে নামলাম ।

@@

গা-ঘেঁষে কোনো গাড়ি যদি হার্ডব্রেক করে তা হলে চমকে ওঠাই নিয়ম। শুধু চমকে ওঠা না, চমকে পেছন ফিরতে হবে। এরকম পরিস্থিতির মুখোমুখি আমি মাঝেমধ্যেই হই। রূপা এই কাণ্ডটা সবচে বেশি করে। গাড়ি নিয়ে হুট করে গা-ঘেঁষে দাঁড়াবে, এবং

বিকট শব্দে হর্ন দেবে। ভেতরে ভেতরে চমকালেও বাইরে প্রকাশ করি না। কিছুই ঘটেনি ভঙ্গিতে হাঁঠতে থাকে যতক্ষণ গাড়ির ভেতর থেকে চেঁচিয়ে কেউ না ডাকে।

এবারও তা-ই করলাম। ঘ্যাস করে গা-ঘেঁষে গাড়ি থেমেছে। হর্ণ দেয়া হচ্ছে। আমি নির্বিকার ভঙ্গিতে সামনে এগুচ্ছি।

'হিমু সাহেব। এই যে হিমু সাহেব!'

আমি তাকালাম। স্টিয়ারিং হুইল ধরে অপরিচিত একটা মেয়ে বসে আছে। মেয়েটার মাথায় ইরানি মেয়েদের মতো রঙিন ঝলমলে স্কার্ফ । মেয়েটিকে দেখাচ্ছেও ইরানিদের মতো ।

'আমাকে চিনতে পারছেন না?'

'জি না।'

'সে কী ভালো করে দেখুন তো!'

আমি ভালো করে দেখেও চিনতে পারলাম না। বাংলায় কথা বলে কোনো ইরানি তরুণীর সঙ্গে আমার পরিচয় নেই।

'আমি ফারজানা।'

'ও।'

'ও বলছেন তার মানে এখনও চিনতে পারেননি। আমি ডাক্তার। আপনার চিকিৎসা করেছিলাম। ঐ যে ভয় পেয়ে অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে ভরতি হলেন- ।'

'এখন চিনতে পেরেছি। আপনি ড্রেস অ্যাজ য়্যু লাইক প্রতিযোগিতা করছেন নাকি? ইরানি মেয়ে সেজেছেন।'

'ডাক্তাররা সাজতে পারবে না এমন কোনো আইন আছে?'

'না, আইন নেই।'

'আপনার যদি তেমন কোনো কাজ না থাকে তা হলে উঠে আসুন।'

• • •

আমি গাড়িতে উঠলাম। ফারজানা বলল, আমি খুবই আনাড়ি ধরনের ড্রাইভার। আজই প্রথম সাহস করে একা একা বের হয়েছি। আপনার কাজ হলো সামনের দিকে লক্ষ্য করা, যথাসময়ে আমাকে ওয়ার্নিং দেয়া। পারবেন না?

'পারব। এক কাজ করলে কেমন হয়- ভিড়ের রাস্তা ছেড়ে ফাঁকা রাস্তায় চলে যাই।'

'ঢাকা শহরে ফাঁকা রাস্তা কোথায়?'

'হাইওয়েতে উঠবেন?'

'হাইওয়েতে কখনো উঠিনি।'

'চলুন আজ ওঠা যাক। ময়মনসিং-এর দিকে যাওয়া যাক। পথে ভদ্রটাইপের একটা জঙ্গল পড়বে। গাড়ি পার্ক করে আমরা জঙ্গলে ঢুকে পড়তে পারি।'

'জঙ্গলে ঢুকব কেন?'

'ঢুকতে না চাইলে ঢুকবেন না। আমরা জঙ্গল পাশে ফেলে হোস করে চলে যাব।'

'আপনার পায়ে স্যান্ডেল নেই। সান্ডেল কি ছিঁড়ে গেছে?'

'গাড়ি চালাতে চালাতে পায়ের দিকে তাকাবেন না। এমিতেই আপনি আনাড়ী ড্রাইভার।'

'খুব আনাড়ি কি মনে হচ্ছে?'

'না- খুব আনাড়ি মনে হচ্ছে না।'

'আপনি কি জানেন হাসপাতাল থেকে আপনি চলে যাবার পর বেশ কয়েকবার আপনার কথা আমার মনে হয়েছে? আপনার এক আত্মীয়ের টেলিফোন নাম্বার ছিল । বোধহয় আপনার ফুপা । তাকে একদিন টেলিফোনও করলাম। তিনি বেশ খারাপ ব্যবহার করলেন।'

'ধমক দিলেন?'

'ধমক দেয়ার মতোই। তিনি বললেন, আমাকে টেলিফোন করছেন কেন? হিমুর ব্যাপারে আমি কিছু জানি না। আর কখনো টেলিফোন করে বিরক্ত করবেন না । বলেই খট করে রিসিভার নামিয়ে রাখলেন।'

• • •

আমি হাসলাম ।

ফারজানা বলল, হাসছেন কেন?

‘আপনার গাড়ি চালানো খুব ভালো হচ্ছে- এইজন্যে হাসছি।’

‘আমরা কি ময়মনসিং-এর দিকে যাচ্ছি?’

‘হ্যাঁ।’

‘যে-জঙ্গলের কথা বলছেন সেখানে কি চা পাওয়া যাবে?’

‘অবশ্যই পাওয়া যাবে। পোষা জঙ্গল । সবই পাওয়া যায়। যখন মেডিক্যাল কলেজের ছাত্র ছিলেন, তখন পিকনিক করতে আসেননি।’

‘আমি পড়াশোনা দেশে করিনি। আমার এম ডি ডিগ্রি বাইরের।’

‘বাংলা তো খুব সুন্দর বলছেন।’

‘আমার মা ছিলেন বাঙালি।’

‘ছিলেন বলছেন কেন?’

‘ছিলেন বলছি, কারণ- তিনি এখন নেই। তার খুব শখ ছিল তার মেয়ে দেশে ফিরে দেশের মানুষের সেবা করবে। আমি বাংলাদেশে কাজ করতে এসেছি মা’র ইচ্ছাপূরণের জন্যে । আমি ভেবে রেখেছি— এদেশে পাঁচ বছর কাজ করব, তারপর ফিরে যাব।’

‘ক’বছর পার করেছেন?’

‘তিন বছর কয়েক মাস। দাঁড়ান, একজাক্ট ফিগার বলছি- তিন বছর চার মাস।’

‘বাংলাদেশে কাজ করতে কেমন লাগছে?’

‘মাঝে মাঝে ভালো লাগে। মাঝে মাঝে খুবই বিরক্ত লাগে। এদেশের কিছু মজার ব্যাপার আছে। বিনয়কে এদেশে দুর্বলতা মনে করা হয়, বদমেজাজকে ব্যক্তিত্ব ভাবা হয়। মেয়েমাত্রকেই অল্পবুদ্ধি ভাবা হয়। মেয়ে-ডাক্তার বললেই সবাই ভাবে দাত্রী, যারা বাচ্চা ডেলিভারি ছাড়া আর কিছু জানে না।’

‘বাচ্চা ডেলিভারি ছাড়া আপনি আর কী জানেন?’

• • •

'আমি একজন নিউরোলজিস্ট। আমার কাজকর্ম মানুষের মস্তিস্ক নিয়ে। আপনার প্রতি আমার আগ্রহের এটাও একটা কারণ। যে-কোনো কারণেই হোক আপনি প্রচণ্ড ভয় পেয়ে অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। জ্বরের ঘোরে আপনি প্রলাপ বকতেন। সেইসব আমি শুনেছি। কিছু ম্যাগনেটিক টেপে রেকর্ড করাও আছে।'

'রেকর্ড করেছেন?'

'জি। রেকর্ডও করেছি। খুবই ইন্টারেস্টিং। আসলে আপনার উচিত একজন ভালো কোনো সাইকিয়াট্রিস্টের সঙ্গে কথা বলা । বাংলাদেশে ভালো সাইকিয়াট্রিক্ট আছেন না?'

'আছেন একজন।'

'একজন কেন? অনেক তো থাকার কথা।'

'একজনের নাম খুব শুনি। মিসির আলি সাহেব।'

'ওনার সঙ্গে একটা আপয়েন্টমেন্ট করুন। প্রয়োজন মনে করলে আমিও যাব।'

'আপনার এত আগ্রহ কেন?'

'আমার আগ্রহের কারণ আছে, সেটা আপনাকে বলা যাবে না। ভালো কথা, আপনার সেই বিখ্যাত জঙ্গল আর কতদূর?'

'এসে গেছি। মোড়টা পার হলেই জঙ্গল।'

'জঙ্গলে আরেকদিন গেলে কেমন হয়? আজ ইচ্ছা করছে না।'

'খুব ভালো হয়। শুধু একটা কাজ করুন, আমকে নামিয়ে দিয়ে যান- এসেছি যখন জঙ্গল দেখে যাই।'

'সত্যি নামতে চান?'

'হ্যাঁ চাই।'

'ফেরা কোনো সমস্যা না । বাস পাওয়া যায়।'

ফারজানা দ্বিতীয় প্রশ্ন করল না। আমাকে নামিয়ে দিয়ে গেল।

আমি শালবনে ঢুকে পড়লাম। পিকনিক পার্টি এড়িয়ে আমি ঢুকে পড়লাম গভীর জঙ্গলে । জঙ্গল সম্পর্কে আমার বাবার দীর্ঘ উপদেশ আছে—

• • •

> "যখনই সময় পাইবে তখনই বনভূমিতে যাইবার চেষ্টা করবে। বৃক্ষের সঙ্গে মানবশ্রেণির বন্ধন অতি প্রাচীন। আমার ধারণা আদি মানব একপর্যায়ে বৃক্ষের সহিত কথোপকথন করিত। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের এই ক্ষমতা নষ্ট হইয়াছে। তবে সাধনায় ফল হয়। মন কেন্দ্রীভূত করিতে যদি সক্ষম হও- তবে বৃক্ষের সহিত যোগাযোগেও সক্ষম হইবে। বৃক্ষরাজ তোমাকে এমন অনেক জ্ঞান দিতে সক্ষম হইবে যে-জ্ঞান এমিতে তুমি কখনো পাইবে না।"

কড়া রোদ উঠেছে। শালবনে ছায়া হয় না। তবু মোটামুটি ছায়াময় একটি বৃক্ষ দেখে তার নিচে কুণ্ডলী পাকিয়ে শুয়ে পড়লাম। শীতের রোদ আরামদায়ক। শুকনো পাতার চাদরে শুয়ে আছি। নাড়াচড়া করলেই শুকনো পাতা মচমচ শব্দ করছে। যেমন বলছে- নড়াচড়া করবে না। চুপচাপ শুয়ে থাকো। শালগাছের যে ফুল হয় জানতাম না। পীতাভ ধরনের অনাকর্ষণীয় কিছু ফুল চোখে পড়ছে। শালের ফুলে কি গন্ধ হয়? এত উঁচুতে যে, ছিঁড়ে গন্ধ শোঁকা সম্ভব না। প্রকৃতি নিশ্চয়ই এই ফুল মানুষের জন্যে বানায়নি। মানুষের জন্যে বানালে ফুল ফুটত হাতের নাগালের ভেতর।

ঘুমের ভেতর অদ্ভুত স্বপ্ন দেখলাম- গাছ নিয়ে স্বপ্ন। গাছ আমার সঙ্গে কথা বলছে। তবে উলটাপালটা কথা বলছে- কিংবা মিথ্যা কথা বলছে। যেমন গাছটা বলল, হিমু, তুমি কি জান এই পৃথিবীর সবচে প্রাচীন গাছটি বাংলাদেশে আছে- যার বয়স প্রায় ছ'হাজার বছর?

আমি বললাম, মিথ্যা কথা বলছ কেন? বাংলাদেশ উঠে এসেছে সমুদ্র গর্ভ থেকে। এমন প্রাচীন গাছ এদেশে থাকা সম্ভব নয়।

'তোমাদের বিজ্ঞানীরা কি সব জেনে ফেলেছেন?'

'সব না জানলেও অনেক কিছুই জানেন।'

'গাছ যে একটা চিন্তাশীল জীব তা কি বিজ্ঞানীরা জানেন?'

'অবশ্যই জানেন। জগদীশচন্দ্র বসু বের করে গেছেন।'

• • •

'তা হলে বলো গাছের মস্তিষ্ক কোনটি। একটা গাছ তাঁর চিন্তার কাজটি কীভাবে করে।'

'আমি জানি না, তবে আমি নিশ্চিত উদ্ভিদবিজ্ঞানীরা জানেন।'

'কাঁচকলা। কেউ কিছু জানে না।'

'বিরক্ত করবে না, ঘুমুতে দাও।'

'সৃষ্টিরহস্য বোঝার ব্যাপারে তোমরা গাছের কাছে সাহায্য প্রার্থনা কর না কেন? আমাদের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করলেই তো আমরা সাহায্য করতে পারি।'

'তোমরা সাহায্য করতে পার?'

'অবশ্যই পারি। আমাদের পাতাগুলি অসম্ভব শক্তিশালী অ্যান্টেনা। এই অ্যান্টেনার সাহায্যে আমরা এই বিপুল সৃষ্টিজগতের সব বৃক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করি।'

'তা-ই নাকি?'

'মনে করো সিরাস নক্ষত্রপুঞ্জের একটা গ্রহে গাছ আছে। আমরা সেই গাছের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারি। আমরা সেই গাছ থেকে তোমাদের জন্যে বৈজ্ঞানিক তথ্য এনে দিতে পারি।'

'বাহ, ভালো তো!'

'পৃথিবীর মানুষরা অমর হতে চায়। কিন্তু অমরত্বের কৌশল জানে না। এই অ্যান্ড্রোমিডা নক্ষত্রপুঞ্জেই একটা গ্রহ আছে যার অতি উন্নত প্রাণীরা অমরত্বের কৌশল জেনে গেছে। তোমরা চাইলেই আমরা তোমাদের তা দিতে পারি।'

'শুনে অত্যন্ত প্রীত হলাম।'

'তুমি কি চাও?'

'না, আমি চাই না। আমি যথাসময়ে মরে যেতে চাই হাজার হাজার বছর বেঁচে থেকে কী হবে?'

'তুমি চাইলে আমি তোমাকে বলতে পারি।'

• • •

না, আমি চাচ্ছি না। স্বপ্নে প্রাপ্ত কোনো ঔষধের আমার প্রয়োজন নেই। তুমি যথেষ্ট বিরক্ত করেছ। এখন বিদেয় হও। ভালো কথা, তোমার নাম কী?'

'আমার নাম টরমেনালিয়া বেরেরিকা।'

'এমন অদ্ভুত নাম!'

'এটা বৈজ্ঞানিক নাম- সহজ নাম বহেরা। আমরা কিন্তু অদ্ভুত গাছ। শালবনের ফাঁকে গজাই এবং লম্বায় শালগাছকেও ছাড়িয়ে যাই। আমাদের বাকলের রঙ কী বলো তো? বলতে পারলে না। আমাদের বাকলের রঙ নীল। আচ্ছা যাও, আর বিরক্ত করব না। এখন ঘুমাও।'

আমার ঘুম ভাঙল সন্ধ্যার আগে-আগে। জেগে উঠে দেখি সত্যি সত্যি একটা বহেরা গাছের নিচেই শুয়ে আছি । গাছভরতি ডিমের মতো ফুল। আমি খানিকটা ধাঁধায় পড়ে গেলাম। আমার পরিষ্কার মনে আছে- আমি শুয়েছিলাম শালগাছের নিচে। শালের ফুল দেখতে দেখতে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম।

ঢাকায় যেতে হবে পায়ে হেঁটে । সেটা খুব খারাপ হবে না। শীতকালে হাঁটার আলাদা আনন্দ । তবে ঢাকায় কতক্ষণে পৌছাব কে জানে। মিসির আলি সাহেবের সঙ্গে আমার দেখা করা দরকার। দেখাটা আজ রাতেও হতে পারে। এক কাপ চা খাওয়া দরকার। বনের ভেতর কে আমাকে চা খাওয়াবে! আমি গলা উচিয়ে বললাম, আমার চারদিকে যেসব গাছ-ভাইরা আছেন তাদের বলছি। আমার খুব চায়ের তৃষ্ণা হচ্ছে। আমি আপনাদের অতিথি- আপনারা কি আমাকে এক কাপ চা খাওয়াতে পারেন?

প্রশ্নটা করেই আমি চুপ করে গেলাম। উত্তরের জন্যে কান পেতে রইলাম। উত্তর পাওয়া গেল না, তবে কয়েক মুহূর্তের জন্যে আমার মনে হচ্ছিল গাছরা উত্তর দেবে।

দরজায় কোনো কলিংবেল নেই।

পুরানা স্টাইলে কড়া নাড়তে হয়। প্রথমবার কড়া নাড়তেই ভেতর থেকে শ্লেষ্মা-জড়ানো গলায় জবাব এল-কে? আমি চুপ করে রইলাম। প্রথমবারের 'কে'-তে জবাব

• • •

দিতে নেই। দ্বিতীয়বারে জবাব দিতে হয়। এই তথ্য আমার মামার বাড়িতে শেখা। ছোটমামা বলেছিলেন-

'বুঝলি হিমু, প্রথম ডাকে কখনো জবাব দিবি না। খবর্দার না! তুই হয়তো ঘুমুচ্ছিস, নিশুতিরাতে বাইরে থেকে কেউ ডাকল-হিমু তুই বললি, জি? তা হলেই সর্বনাশ! মানুষ ডাকলে সর্বনাশ না। মানুষ ছাড়া অন্য কেউ ডাকলে সর্বনাশ। বাঁদা পড়ে যাবি। তোকে ডেকে বাইরে নিয়ে যাবে। এর নাম নিশির ডাক। কাজেই সহজ বুদ্ধি হচ্ছে- যে-ই ডাকুক প্রথমবারে সাড়া দিবি না। চুপ করে থাকবি। দ্বিতীয়বারে সাড়া দিবি। মনে থাকবে?'

আমার মনে আছে বলেই প্রথমবারে জবাব না দিয়ে দ্বিতীয়বারের জন্যে অপেক্ষা করতে লাগলাম। আবার কড়া নাড়লাম যাতে মিসির আলি সাহেব দ্বিতীয়বার বলেন- কে? আমি আমার পরিচয় দিতে পারি।

মিসির আলি দ্বিতীয়বার 'কে' বললেন না। দরজা খুলে বাইরে তাকালেন। খুব যে কৌতুহলী হয়ে তাকালেন তাও না। রাত একটার আগন্তুকের দিকে যতটুকু কৌতুহল নিয়ে তাকাতে হয় সে-কৌতুহলও তার চোখে নেই। পরনে লুঙ্গি। খালিগায়ে সাদা চাদর জড়ানো। ভদ্রলোকের মাথাভরতি কাঁচাপাকা চুল। আমি ভেবেছিলাম টেকোমাথার কাউকে দেখব। আইনস্টাইন-মার্কা এত চুল ভাবিনি। আমি বললাম, স্যার শ্লামালিকুম।

'ওয়ালাইকুম সালাম।'

'আমার নাম হিমু।'

'আচ্ছা।'

'আপনার সঙ্গে কি কথা বলতে পারি?'

মিসির আলি দরজা ধরে দাঁড়িয়ে আছেন। তাঁর দৃষ্টি আগের মতো কৌতূহলশূন্য। তিনি কি বিরক্ত? বোঝা যাচ্ছে না। ভদ্রলোক কি ঘুম থেকে উঠে এসেছেন? না বোধহয়। ঘুমন্ত মানুষ প্রথমবার কড়া নাড়তেই কে বলে সাড়া দেবে না।

• • •

আমি বিনীত ভঙ্গিতে বললাম, কথা বলার জন্যে রাত দুটা খুব উপযুক্ত সময় নয়। আপনি জেগে ছিলেন তাই দরজার কড়া নেড়েছি। আপনি যদি বলেন তা হলে অন্য সময় আসব।

'আমি জেগে ছিলাম না, ঘুমুচ্ছিলাম। যা-ই হোক, আসুন, ভেতের আসুন।'

আমি ভেতরে ঢুকলাম। মিসির আলি সাহেব দরজার হুক লাগালেন। দরজার হুকটা বেশ শক্ত, লাগাতে তার কষ্ট হলো। অন্য কেউ হলে দরজার হুক লাগাত না। যে-অতিথি কিছুক্ষণের মধ্যে চলে যাবে তার জন্যে এত ঝামেলা করে দরজা বন্ধ করার দরকারটা কী !

'বসুন। ঐ চেয়ারটায় বসুন। হাতলের কাছে একটা পেরেক উঁচু হয়ে আছে। পাঞ্জাবিতে লাগলে পাঞ্জাবি ছিঁড়বে।'

মিসির আলি সাহেব পাশের ঘরে ঢুকে গেলেন। আমি বসে বসে ঘরের সাজসজ্জা দেখতে লাগলাম। উল্লেখ করার মতো কিছুই চোখে পড়ছে না। কয়েকটা বেতের চেয়ার । গোল একটা বেতের টেবিল । টেবিলের উপরে বাংলা ম্যাগাজিন। উপরের পাতা ছিঁড়ে গেছে বলে ম্যাগাজিনের নাম পড়া যাচ্ছে না। এক কোনায় একটা চৌকি। চৌকিতে বিছানা পাতা। এই বিছানায় কে ঘুমায়? মিসির আলি সাহেব? মনে হয় না। এই ঘরে আলো কম। বিছানায় শুয়ে বই পড়া যাবে না। মিসির আলি সাহেবের নিশ্চয়ই বিছানায় শুয়ে বই পড়ার অভ্যাস। তার শোবার ঘরটা দেখতে পারলে হতো।

মিসির আলি ঢুকলেন। তার দুহাতে দুটা মগ । মগভরতি চা ।

'নিন, চা নিন। দুচামচ চিনি দিয়েছি- আপনি কি চিনি আরও বেশি খান?'

'জি না। যে যতটুকু চিনি দেয় আমি ততটুকুই খাই।'

তিনি আমার সামনের চেয়ারে বসলেন। এরকম বিশেষত্বহীন চেহারার মানুষ আমি কম দেখেছি। কে জানে বিশেষত্বহীনতাই হয়তো তার বিশষত্ব। চা খাচ্ছেন শব্দ করে। নিজের চায়ের স্বাদে মনে হয় নিজেই মুগ্ধ। আমি এত আরাম করে অনেকদিন কাউকে চা খেতে দেখিনি।

• • •

‘তারপর হিমু সাহেব, বলুন আমার কাছে কেন এসেছেন।’

‘আপনাকে দেখতে এসেছি স্যার।’

‘ও আচ্ছা । এর আগে বলেছিলেন কথা বলতে এসেছেন। আসলে কোনটা?’

‘দুটাই। চোখ বন্ধ করে তো আর কথা বলব না- আপনার দিকে তাকিয়েই কথা বলব।’

‘তাও তো ঠিক। বলুন, কথা বলুন। আমি শুনছি।’

‘মানুষের যে নানান ধরনের অতীন্দ্রিয় ক্ষমতার কথা শোনা যায় আপনি কি তা বিশ্বাস করেন?’

‘আমি সেরকম অতীন্দ্রিয় ক্ষমতাসম্পন্ন মানুষ এখনও কাউকে দেখিনি, কাজেই বিশ্বাস-অবিশ্বাসের প্রশ্ন আসে না। আমার মন খোলা, তেমন ক্ষমতাসম্পন্ন কাউকে দেখলে অবশ্যই বিশ্বাস করব।

‘আপনি দেখতে চান?’

‘জি না। আমার কৌতুহল কম। নানান ঝামেলা করে কোনো এক পীরসাহেবের কাছে যাব, তার কেরামতি দেখব, সেই ইচ্ছা আমার নেই।’

‘কেউ যদি আপনার সামনে এসে আপনাকে কোনো কেরামতি দেখাতে চায় আপনি দেখবেন?’

মিসির আলি চায়ের মগ নামিয়ে রাখলেন। এদিক-ওদিক তাকাচ্ছেন—সম্ভবত সিগারেট খুঁজছেন। এই ঘরে সিগারেট নেই। আমি ঘরটা খুব ভালোমতো দেখেছি। মিসির আলি সাহেবের কাছে যেহেতু এসেছি স্বভাবটাও তার মতো করার চেষ্টা করছি। পর্যবেক্ষণ-ক্ষমতাকে বাড়িয়ে দেবার চেষ্টা । আমি লক্ষ্য করলাম, মিসির আলি সাহেবের চেহারায় সূক্ষ্ম হতাশার ছাপ পড়ল- অর্থাৎ শোবার ঘরেও সিগারেট নেই। নিকোটিনের অভাবে তিনি খানিকটা কাতর বোধ করছেন ।

আমি বলরাম, স্যার, আমার কাছে সিগারেট নেই।

• • •

ভেবেছিলাম তিনি আমার কথায় চমকাবেন। কিন্তু চমকালেন না। তবে তার ঠোঁটে সূক্ষ্ম একটা হাসির ছায়া দেখলাম। হাসিটা কি ব্যঙ্গের? কিংবা আমার ছেলেমানুষিতে তার হাসি পাচ্ছে? না মনে হয়।

'স্যার, আমি নিজেও সামান্য ভবিষ্যৎ বলতে পারি। ঠিক আড়াইটার সময় কেউ একজন এসে আপনাকে এক প্যাকেট সিগারেট দেবে।'

মিসির আলি এবারে সহজ ভঙ্গিতে হাসলেন। চায়ের মগে চুমুক দিয়ে দিতে বললেন, সেই কেউ-একজনটা কি আপনি?

'জি স্যার। আড়াইটার সময় আমি আপনার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আপনাকে এক প্যাকেট সিগারেট কিনে দিয়ে যাব।'

'দোকান খোলা পাবেন?'

'ঢাকা শহরে কিছু দোকান আছে খোলেই রাত একটার পর।'

'ভালো।'

আমি মিসির আলি সাহেবের দিকে একটু ঝুঁকে এসে বললাম, আমি কিন্তু স্যার মাঝে মাঝে ভবিষ্যৎ বলতে পারি। সবসময় পারি না- হঠাৎ-হঠাৎ পারি।

'ভালো তো!'

'আপনি কি আমার মতো কাউকে পেয়েছেন যে মাঝে মাঝে ভবিষ্যৎ বলতে পারে?'

'সব মানুষই তো মাঝে মাঝে ভবিষ্যৎ বলতে পারে। এটা আলাদা কোনো ব্যাপার না। ইনটিউটিভ একটা বিষয় । মাঝে মাঝে ইনটিউশন কাজে লাগে, মাঝে মাঝে লাগে না। মস্তিষ্ক ভবিষ্যৎ বলে যুক্তি দিয়ে। সেইসব যুক্তির পুরোটা আমরা বুঝতে পারি না বলে আমাদের মনে হয় আমরা আপনা-আপনি ভবিষ্যৎ বলছি।'

'আমার ভবিষ্যৎ বলার ক্ষমতা ইনটিউটিভ গেজ ওয়ার্কের চেয়েও সামান্য বেশি। আমি ব্যাপারটা বুঝতে পারছি না বলে আপনার কাছে এসেছি।'

'আপনার ভবিষ্যৎ বলার ক্ষমতী সম্পর্কে অন্যরা জানে?'

'যারা আমার কাছাকাছি থাকে, যারা আমাকে ভালোমতো চেনে তারা জানে।'

• • •

'আপনার আশেপাশের মানুষদের এই ক্ষমতা দেখাতে আপনার ভালো লাগে, তাই না?'

'জি, ভালোই লাগে। একজন ম্যাজিশিয়ান সুন্দর একটা ম্যাজিক দেখাবার পর যেমন আনন্দ পায়- আমিও সেরকম আনন্দ পাই।'

'হিমু সাহেব!'

'জি স্যার?'

'আমার ধারণ আপনি একধরনের ডিলিউশনে ভুগছেন। ডিলিউশন হচ্ছে নিজের সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণা। যে-কোনো কারণেই হোক আপনার ভেতর একটা ধারণা জন্মেছে আপনি সাধুসন্ত-টাইপের মানুষ। আপনার খালি পা, হলুদ পাঞ্জাবি এইসব দেখে তা-ই মনে হচ্ছে। যে-কোনো ডিলিউশন মানুষের মাথায় একবার ঢুকে গেলে তা বাড়তে থাকে। আপনারও বাড়ছে। আপনি নিজে আপনার ভবিষ্যৎ বলার ক্ষমতা নিয়ে একধরনের অহংকার বোধ করছেন। আপনাকে যতই লোকজন বিশ্বাস করছে আপনার ততই ভালো লাগছে। এখন রাত দুটায় আপনি আমার কাছে এসেছেন- বিশ্বাসীর তালিকা বৃদ্ধির জন্যে। রাত দুটার সময় না এসে আপনি সকাল দশটায় আসতে পারতেন। আসেননি, কারণ যে সাধু সেজে আছে সে যদি সকাল দশটায় আসে তা হলে তার রহস্য থাকে না। রহস্য বজায় রাখার জন্যেই আসতে হবে রাত দুটার দিকে। হিমু সাহেব!'

'জি স্যার?'

'আপনার সম্পর্কে আমি কিছু জানি না। আপনি আমাকে নিজের সম্পর্কে কিছু বলেননি। তবে আমি মোটামুটি নিশ্চিত নিজেকে অন্যের চেয়ে আলাদা প্রমাণ করার জন্যে আপনি অদ্ভূত আচার-আচরণ করেন। যেমন আপনার পায়ের অবস্থা দেখে মনে হচ্ছে আপনি প্রচুর হাঁটেন। মনে হচ্ছে রাতেই হাঁটেন। কারণ দিনে হাঁটা তো স্বাভাবিক কর্মকাণ্ডে পড়ে। যেহেতু আপনি রাতে হাঁটেন- বিচিত্র সব মানুষের সঙ্গে আপনার পরিচয় আছে। আপনার ডিলিউশনকে পোক্ত করতে এরাও সাহায্য করে। এদের কেউকেউ

আপনাকে বিশ্বাস করতে শুরু করে। আপনার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা মানেই আপনাকে সাহায্য করা। আমার ধারণা এদের কেউ-কেউ আপনাকে সাধুও ভাবে। আপনার পদধূলি নেয়।'

'মানুষ কোনো কারণ ছাড়াই একজনকে সাধু হিসেবে বিশ্বাস করতে শুরু করবে?'

'হ্যাঁ, তা করবে। মানুষ খুব যুক্তিবাদী প্রাণী হলেও তার মধ্যে অনেকখানি অংশ আছে যুক্তিহীন। মানুষ যুক্তি ছড়াই বিশ্বাস করতে ভালোবাসে। প্রাণী হিসেবে মানুষ সবসময় অসহায় বোধ করে। সে সারাক্ষণ চেষ্টা করে অসহায়তা থেকে মুক্তি পেতে । পীর-ফকির, সাধু-সন্ন্যাসী, হস্তরেখা, অ্যাস্ট্রলজি, নিউম্যারোলজির প্রতি এইসব কারণেই মানুষের বিশ্বাস।'

'আপনার ধারণা, মানুষ কোনো বিশেষ ক্ষমতা নিয়ে পৃথিবীতে আসেনি?'

'অবশ্যই মানুষ বিশেষ ক্ষমতা নিয়ে পৃথিবীতে এসেছে। একদিন যে-মানুষ সমগ্র নক্ষত্রমণ্ডল জয় করবে তার ক্ষমতা অসাধারণ । তবে তার মানে এই না সে ভবিষ্যৎ বলবে। দুটা বেজে গেছে- আপনার কথা ছিল না আমার জন্যে এক প্যাকেট সিগারেট এনে দেয়ার?'

আমি উঠে দাঁড়ালাম। মিসির আলি বললেন, চলুন আপনার সঙ্গে যাই। কোন দোকানটা রাত দুটার সময় খেলা থাকে আমাকে দেখিয়ে দিন। মাঝে মাঝে সিগারেটের জন্যে খুব সমস্যায় পড়ি।

মিসির আলি তার ঘরের দরজায় তালা লাগালেন না। তালা খুঁজে পাচ্ছেন না। ঘর খোলা রেখে গভীর রাতে বের হচ্ছেন তার জন্যেও তার মধ্যে কোনো অস্বস্তি লক্ষ্য করলাম না। ঘর খোলা রেখে বাইরে যাবার অভ্যাস তার নতুন না এটা বোঝা যাচ্ছে। মনে হচ্ছে তার মধ্যেও খানিকটা হিমুভাব আছে।

'হিমু সাহেব!'

'জি স্যার?'

• • •

'আপনি আমার কথায় আপসেট হবেন না। আমি আপনাকে হার্ট করার জন্যে কিছু বলিনি।'

'আপনি যে এ-ধরনের কথা বলবেন তা আমি জানতাম।'

'সব জেনেশুনেই আমার কাছে এসেছেন?'

'জি স্যার।'

'আমার ধারণা আপনি আমার কাছে এসেছেন অন্য কোনো সমস্যা নিয়ে- যা আপনি বলছেন না।'

'স্যার, আমি আপনাকে একটা জিনিস দেখাতে চাই।'

'কী জিনিস?'

'আমি কিছুদিন আগে প্রচণ্ড ভয় পেয়েছিলাম। যা দেখে ভয় পেয়েছিলাম, সেই জিনিসটা আপনাকে দেখাতে চাই।'

'কেন? আপনি চান যে আমিও ভয় পাই?'

'তা না।'

'তবে?'

'আমার কাছে শুনে আপনি ব্যাপারটা সম্পর্কে ধারণা করতে পারবেন না।'

'তবু শুনি।'

আমি ভয় পাবার গল্পটা প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত বললাম। মিসির আলি গল্পের মাঝখানে একবারও কিছু জানতে চাইলেন না- হ্যাঁ-হু পর্যন্ত বললেন না। সিগারেট কিনলাম। তিনি একটা সিগারেট ধরালেন। তারপর বললেন, আপনি একটা কাজ করুন। গল্পটা আবার বলুন।

'আবার বলব?'

'হ্যাঁ, আবার।'

'কেন?'

'দ্বিতীয়বার শুনে দেখি কেমন লাগে।'

• • •

আমি আবারও গল্প শুরু করলাম। মিসির আলি সিগারেট টানতে টানতে তার বাসার দিকে যাচ্ছেন। আমি সঙ্গে সঙ্গে যাচ্ছি এবং গল্প বলছি। তিনি নিঃশব্দে শুনে যাচ্ছেন। আমি তার মুখে চাপা হাসিও লক্ষ্য করছি।

'হিমু সাহেব!'

'আপনার গল্পটা ইন্টারেস্টিং, আমি আপনার সঙ্গে পরে এই নিয়ে কথা বলব।'

'আপনি যদি চান, যে-জায়গাটায় আমি ভয় পেয়েছিলাম সেখানে নিয়ে যেতে পারি।'

'আমি চাচ্ছি না।'

'তা হলে স্যার আমি যাই।'

'আচ্ছা। আবার দেখা হবে। ভালো কথা, যে-গলিতে আপনি ভয় পেয়েছিলেনআপাতত সেই গলিতে না ঢোকা ভালো হবে।'

'এই কথা কেন বলছেন?'

'হঠাৎ ব্রেইনে চাপ সৃষ্টি না করাই ভালো। মানুষের একটা অসুখের নাম "এরিকনোফোবিয়া"- মাকড়সাভীতি। এই অসুখ থেকে মানুষকে মুক্ত করার একটা পদ্ধতি হচ্ছে তার গায়ে মাকড়সা ছেড়ে দেয়া। মাকড়সা তার গায়ে কিলবিল করে হাঁটবে এবং রোগী বুঝতে পারবে যে মাকড়সা অতি নিরীহ প্রাণী। তাকে ভয় পাবার কিছু নেই। এই চিকিৎসাপদ্ধতিতে মাঝে মাঝে রোগ ভালো হয়, তবে কিছু ক্ষেত্রে খুব খারাপ ফল হয়— রোগী তখন চারদিকে মাকড়সা দেখতে পায়। আমি চাই না— আপনার ক্ষেত্রে এই ঘটনা ঘটুক।'

'স্যার যাই?'

'আচ্ছা।'

আমি চলে আসছি। রাস্তার শেষ মাথায় গিয়ে ফিরে তাকালাম । মিসির আলি ঘরে ঢোকেননি। এখনও বাইরে দাঁড়িয়ে সিগারেট টানছেন। তাকিয়ে আছেন আকাশের দিকে। কী দেখছেন, তারা? আমি একটু বিস্মিত হলাম— মিসির আলি ধরনের মানুষেরা মাইক্রোসকোপ টাইপ- কাছের জিনিসকে তারা সাবধানে দেখতে ভালোবাসেন ।

• • •

ধরাছোঁয়ার বাইরের জগতের প্রতি তাদের আগ্রহ থাকার কথা না। তাঁরা অসীমের অনুসন্ধান করেন সীমার ভেতর থেকে।

মেসে ফিরে যেতে ইচ্ছা করছে না। মনে হচ্ছে রাতটা হেঁটে হেঁটেই কাটিয়ে দিই, যদিও ক্লান্তিতে শরীর ভেঙে আসছে। পা ভরি হয়েছে। ঘুমে চোখ বন্ধ হয়ে আসছে। বস্তা-ভাইয়ের পাশে গিয়ে কি শুয়ে থাকব? স্লিপিংব্যাগ তাদের জীবন কেমন কাটছে সেটাও দেখতে ইচ্ছা করছে- ছেলেটার নাম যেন কি? গাবলু? না, গাবলু না। অন্যকিছু। নামটা কি সে আমাকে বলেছে? আচ্ছা প্রতিটি গাছের কি মানুষের মতো নাম আছে? গাছ-মা কি তার গাছশিশুদের নাম রাখে? আমরা যেমন গাছের নামে নাম রাখি- শিমুল, পলাশ, বাবলা- ওরাও কি পছন্দের মানুষের নামে তাদের পুত্রকন্যাদের নাম রাখে? যেমন একজনের নাম রাখল হিমু, আরেকজনের সোলায়মান ।

ও হ্যাঁ, মনে পড়েছে- বস্তা-ভাইয়ের পুত্রের নাম সুলায়মান। সুলায়মাকে দেখতে ইচ্ছা করছে।

স্লিপিংব্যাগের ভেতর পিতাপুত্র দুজনই ঘুমুচ্ছিল। আমি তাদের ঘুম ভাঙালাম না। তারে পাশে শুয়ে পড়লাম। এরা মনে হচ্চে আমার জন্যে জায়গা রেখেছে। পাশের জায়গাটায় খবরের কাগজ বিছিয়ে রেখেছে। শুধু যে খবরের কাগজ তা না, খবরের কাগজের উপর বড় পলিথিনের চাদর । আমি শোয়ামাত্র স্লিপিংব্যাগের মুখ খুলে গেল। সুলায়মান তার মাথা বের করল।

'কী খবর সুলায়মান?'

সুলায়মান হাসল। তার সামনের দুটা দাঁত পড়ে গেছে।

দাঁত-পড়া সুলায়মানকে সুন্দর দেখাচ্ছে। সুলায়মান লাজুক গলায় বলল, আফনের জন্যে বাপজান জায়গা রাখছে।

'ভালো করেছে।'

'এখন থাইক্যা আফনের এই জাগা "রিজাভ"।'

• • •

‘বাঁচা গেল! সব মানুষেরই কিছু-না-কিছু রিজার্ভ জায়গা দরকার। তুই কি পড়তে পারিস?’

‘জ্বে না।’

‘পড়াশোনা তো করা দরকার রে ব্যাটা।’

‘গরিব মানুষের পড়ালেখা লাগে না।’

‘কে বলেছে?’

‘কেউ বলে নাই- আমি জানি।’

‘এখন থেকেই নিজে নিজে জানা শুরু করেছিস?’

সুলায়মান দাঁত বের করে হাসল। চোখ অন্যদিকে ফিরিয়ে বলল, আফনেরে কী ডাকুম?

‘যা ডাকতে ইচ্ছা হয় ডাক। কী ডাকতে ইচ্ছা করে?’

‘মামা।’

‘বেশ তো, মামা ডাকবি।’

‘মামা, আফনে কিচ্ছা জানেন?’

‘জানি– শুনবি?’

সুলায়মান হ্যাঁ-না কিছু বলল না। খুব সাবধানে স্লিপিংব্যাগ থেকে বের হয়ে এল । সম্ভবত সে তার বাবার ঘুম ভাঙাতে চাচ্ছে না। সুলায়মান এসে শুয়ে পড়ল আমার পাশে। আমি গল্প শুরু করলাম- আলাউদ্দিনের চেরাগের গল্প, যে-চেরাগের ভেতর অসীম ক্ষমতাসম্পন্ন দৈত্য ঘুমিয়ে থাকে। তাঁর যদি ঘুম ভাঙানো যায় তা হলে সে অসাধ্য সাধন করতে পারে। সব মানুষকেই একটি করে আলাউদিনের চেরাগ দিয়ে পৃথিবীতে পাঠানো হয়। অল্পকিছু মানুষই চেরাগে ঘুমিয়ে-থাকা দৈত্যকে জাগাতে পারে।

‘সুলায়মান!’

‘জি মামা?’

• • •

‘তোর মনের যে-কোনো একটা ইচ্ছার কথা বল তো দেখি ! তোর যে-কোনো একটা ইচ্ছা পূর্ণ হবে।’

‘আমার কোনো ইচ্ছা নাই মামা।’

আচ্ছা, তা হলে স্লিপিংব্যাগের ভেতর চলে যা । বাবার সঙ্গে ঘুমিয়ে থাক।’

‘আমি আফনের লগে ঘুমামু।’

সুলায়মান একটা হাত আমার গায়ে তুলে দিয়েছে। আমি চলে গেছি একটা অদ্ভুত অবস্থায়, ঘুমে চোখ জড়িয়ে আসছে, অথচ ঘুম আসছে না। চোখ মেলে রাখতেও পারছি না, আবার বন্ধও করতে পারছি না। বিশ্রী অবস্থা!

‘হ্যালো, আঁখি কি বাসায় আছে?’

‘আপনি কে বলছেন?’

‘আমার নাম হিমু?’

‘হিমুটা কে?’

‘জি, আমি নীতুর বড় ভাই। নীতু হলো আঁখির বান্ধবী।’

‘তুমি আঁখির সঙ্গে কথা বলতে চাও কেন?’

‘নীতুকে গতকাল থেকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। আঁখিদের বাসায় যাচ্ছি বলে ঘর থেকে বের হয়েছে, আর ফিরে আসেনি। আমরা আঁখিদের বাসা কোথায়, টেলিফোন নাম্বার কী, কিছুই জানতাম না। অনেক কষ্টে টেলিফোন নাম্বার পেয়েছি। মা খুব কান্নাকাটি করছেন। ঘনঘন ফিট হচ্ছেন...’

‘কী সর্বনাশ। ফিট হওয়ারই তো কথা। শোনো হিমু, নীতু নামে কেউ এ-বাড়িতে আসেনি। নীতু কেন, কোনো মেয়েই আসেনি।’

‘আপনি একটু আঁখিকে দিন। আঁখির সঙ্গে কথা না বলা পর্যন্ত মা শান্ত হবেন না। মা কথা বলবেন।’

• • •

‘তুমি ধরো, আমি আঁখিকে ডেকে দিচ্ছি। আজকালকার মেয়েদের কী যে হয়েছে। মাই গড- চিন্তাও করা যায় না।’

আমি ফোঁপানির মতো আওয়াজ করে নিজের প্রতিভায় নিজেই মুগ্ধ হয়ে গেলাম। আঁখিকে টেলিফোনে কিছুতেই পাওয়া যাচ্ছিল না- এই অভিনয়টা সেই কারণেই দরকার হয়ে পড়েছিল।

আঁখি টেলিফোন ধরল। ভীত গলায় বুলল কে?

‘আমি হিমু। নীতুর বড় ভাই।’

‘আমি তো নীতু বলে কাউকে চিনি না।’

‘আমি নিজেও চিনি না । নীতুর গল্পটা তৈরি করা ছাড়া উপায় ছিল না। কেউ তোমাকে টেলিফোন দিচ্ছিল না ।’

‘আপনি কে?’

‘আমি হিমু।’

‘হিমু নামেও তো আমি কাউকে চিনি না!’

‘আমি বাদলের দূর সম্পর্কের ভাই। ঐ যে, যার সঙ্গে তোমার বিয়ে হতে যাচ্ছিল! তুমি পালিয়ে চলে গেলে বলে বিয়ে হয়নি।’

‘আপনি কী চান?’

‘আমি কিছুই চাই না— বাদলের কারণে তোমাকে টেলিফোন করেছি। ও বোকাটাইপের তো, বিয়ে ভেঙে যাওয়ায় নানান ধরনের পাগলামি করছে- আমরা অস্থির হয়ে পড়েছি। তুমি ওকে বিয়ে না করার সিদ্ধান্ত নিয়ে খুব ভালো কাজ করেছ। বোকা স্বামীর সঙ্গে সংসার করা ভয়াবহ ব্যাপার।’

‘উনি বোকা?’

‘বোকা তো বটেই। ও হলো বোকান্দর। বোকা যোগ বান্দর- বোকান্দর । সন্ধি করলে এই দাঁড়ায়। বোকা মানুষদের প্রতি বুদ্ধিমানদের কিছু দায়িত্ব আছে। তুমি বুদ্ধিমতী মেয়ে, তুমি যদি এই দায়িত্ব পালন কর।’

• • •

‘আমি বুদ্ধিমতী আপনাকে কে বলল?’

‘শেষমূহুর্তে তুমি বাদলকে বিয়ে করতে রাজি হওনি- এটি হচ্ছে তোমার বুদ্ধির প্রধান লক্ষণ। আঁখি শোনো- তুমি বাদলের পাগলামি কমাবার একটা ব্যবস্থা করে দাও।’

‘সরি, আমি কিছু করতে পারব না।’

‘ও কিসব পাগলামি করছে শুনলে তোমার মায়া হবে। একটা শুধু বলি- রাত বারোটার পর ও তোমাদের বাসার সামনে হাঁটাহাটি করে। অন্য সময় করে না, কারণ অন্য সময় হাঁটাহাটি করলে তুমি দেখে ফেলবে। সেটা নাকি তার জন্যে খুব লজ্জার ব্যাপার হবে।’

‘শুনুন, ভালো একটা মেয়ে দেখে আপনারা ওনার বিয়ে দিয়ে দিন- দেখবেন পাগলামি সেরে যাবে।’

‘সেটাই করা হচ্ছে। মেয়ে পছন্দ করা হয়েছে। মেয়ে খুব সুন্দর। শুধু একটু শর্ট- পাঁচ ফুট। হাইহিল পরলে অবিশ্যি বোঝা যায় না। মেয়ে গান জানে- রেডিওতে বি গ্রেডের শিল্পী।’

‘ভালোই তো!’

‘ভালো তো বটেই। ছাত্রও খুব ভালো- এস.এস.সি-তে চারটা লেটার এবং স্টার পেয়েছে। চারটা লেটারের একটা আবার ইংরেজিতে । ইংরেজিতে লেটার পাওয়া সহজ না।’

‘আজকাল অনেকেই পাচ্ছে।’

‘যারা পাচ্ছে তারা তো আর এম্নি এম্নি পাচ্ছে না খোঁজ নিলে দেখা যাবে চেম্বারস ডিকশনারি পুরোটা মুখস্থ।’

‘আচ্ছা শুনুন- আপনার কথা শেষ হয়েছে তো? আমি এখন রেখে দেব।’

‘তুমি কোনো সাহায্য করতে পারবে না, তা-ই না?’

‘জি না । মেয়েটার নাম কী?”

‘কোন মেয়েটার নাম?’

• • •

‘যার সঙ্গে আপনার ভাইয়ের বিয়ে হচ্ছে।’

‘তুমি সাহায্য না করলে তো বাদলের বিয়ে হবে না। আগে বাদলের ঘাড় থেকে “আঁখি”-ভূতকে নামাতে হবে। ঘাড় খালি হলেই “বাঁধন”-ভূত চেপে বসবে।

‘মেয়েটার নাম বাঁধন?’

‘হ্যাঁ।’

‘খুব কমন নাম- I’

‘কমনের ভেতরই লুকিয়ে থাকে আনকমন । আঁখি নামটাও তো কমন। কিন্তু তুমি তো আর কমন মেয়ে না।’

‘আমিও কমন-টাইপের মেয়ে।’

‘অসম্ভব’ কমন-টাইপের কোনো মেয়ে বিয়ের দিন বিয়ে ভেঙে দিয়ে প্রেমিকের কাছে চলে যায় না। কমন-টাইপের মেয়ে প্রেমিকের কথা ভুলে গিয়ে খুশিমনে বিয়ে করে ফেলে।’

‘শুনুন, আপনি খুব অশালীন কথা বলছেন। আমি কোনো প্রেমিকের কাছে যাইনি। আমার কোনো প্রেমিক নেই।’

‘ও আচ্ছা।’

‘মা’র সঙ্গে রাগ করে চলে গিয়েছিলাম। ঘটনাটা শুনতে চান?’

‘না।’

‘না বললে হবে না, আপনাকে শুনতে হবে। আমাদের বাড়িতে খুব অদ্ভুত ব্যবস্থা। কখনোই কেউ আমার ইচ্ছায় কিছু করে না। কখনোই না। মনে করুন, ঈদের জন্যে শাড়ি কেনা হবে। আমার একটা হলুদ শাড়ি পছন্দ। আমি সেটা কিনতে পারব না। মা বলবে- হলুদ শাড়ি তোমাকে মানায় না। ছোটবেলায় খুব শখ ছিল নাচ শিখব। আমাকে শিখতে দেয়া হয়নি। নাচ শিখে কী হবে? আমার শখ ছিল সায়েন্স পড়ব- জোর করে আমকে হিউম্যানিটিজ গ্রুপে দেয়া হলো। ধরুন আমার যদি কোনো টেলিফোন আসে– আমাকে সে-টেলিফোন ধরতে দেয়া হবে না। দফায়-দফায় নানান প্রশ্নের ভেতর দিয়ে

যেতে হবে। “কে টেলিফোন করল?” “বান্ধবী?” বান্ধবীর বাসা কোথায়?” “বাবা কী করেন?” ধরুন আমি কোনো বান্ধবীর সঙ্গে কথা বলছি- হুট করে একসময় মা করবে কি, হাত থেকে রিসিভার নিয়ে কানে দিয়ে শুনবে আসলেই কোনো মেয়ে কথা বলছে, না কোনো ছেলে কথা বলছে। আমার গায়ে হলুদের দিন কী হলো শুনুন। আমি মাছ খেতে পারি না। গন্ধ লাগে। মাছের গন্ধে আমার বমি এসে যায়। না, তাঁর পরেও খেতে হবে। গায়ে-হলুদের মাছ না খেলে অমঙ্গল হয়। মাছ খেলাম, তারপর বমি করে ঘর ভাসিয়ে দিলাম। তখন খুব রাগ উঠে গেল- আমি রিকশা নিয়ে পালিয়ে চলে গেলাম বান্ধবীর বাড়িতে। এই হচ্ছে ঘটনা।’

‘তোমার তা হলে কোনো প্রেমিক নেই?’

‘অপরিচিত কোনো ছেলের সঙ্গে আমার কথা বলার সুযোগ পর্যন্ত নেই- আর আমার থাকবে প্রেমিক! অথচ দেখুন, আমার সব বান্ধবী প্রেমবিশারদ। প্রেমিকের সঙ্গে সিনেমা দেখছে, রেস্টুরেন্টে খেতে যাচ্ছে। জয়দেবপুরে শালবনে হাঁটতে যাচ্ছে। আমার এক বান্ধবী, নাম হলো শম্পা। সে রেজিস্ট্রি করে বিয়ে করে ফেলেছে। দেখুন-না, কীরকম রোমান্টিক। আমার জীবনের একমাত্র স্বপ্ন কী ছিল জানেন? একটা ছেলের সঙ্গে প্রেম হয়ে, তারপর গোপনে তাকে বিয়ে করব।’

‘সেটা তো এখনও করতে পার। তবে তোমার মা-বাবা খুব কষ্ট পাবেন।’

‘আমি চাই তারা কষ্ট পাক।’

‘তা হলে একটা কাজ করলে হয়- তুমি বাদলকেই কোর্টে বিয়ে করে ফ্যালো। কেউ কিছু জানবে না। তোমার বাবা-মা শুরুতে প্রচণ্ড রাগ করবেন। তারপর যখন জানবেন তুমি তাদের পছন্দের পাত্রকেই বিয়ে করেছ তখন রাগ পানি হয়ে যাবে। আইডিয়া তোমার কাছে কেমন লাগছে?’

আঁখি চুপ করে আছে। আঁখি পরিকল্পনা ধুম করে ফেলে দেয়নি। আমি গভীর গলায় বললাম, তোমায় যা করতে হবে তা হচ্ছে— বাবা-মা'কে কঠিন একটা চিঠি লেখা-মা, আমি সারাজীবন তোমাদের কথা শুনেছি। আর না। এখন আমি আমার নিজের জীবন

• • •

নিজেই বেছে নিলাম । বিদায় । বিদায়টা লিখবে প্রথমে ইংরেজি ক্যাপিটেল লেটার B বাংলা দায় । B দায় ।

'আপনি আমাকে থ্রি ফোর-এর বাচ্চা ভাবছেন?'

'ঠাট্টা করছি। তবে তোমাকে যা অবশ্যই করতে হবে তা হচ্ছে- বাসর করতে হবে- অপরিচিত কোনো জায়গায়।'

'কোথায় সেটা?'

'আমার মেসেও হতে পারে। আমার অবিশ্যি খুবই দরিদ্র অবস্থা।'

'যাক, এইসব ছেলেমানুষি আমার ভালো লাগছে না।'

'তা হলে থাক।'

'তা ছাড়া আপনার ভাই বাদল, মিঃ রেইন- ও কি রাজি হবে? আমার কাছে আইডিয়াটা খুবই মজার লাগছে, কিন্তু তার কাছে লাগবে?'

'ও বিরাট গাধা। তুমি যা বলবে ও তাতেই রাজি হবে।'

'মানুষকে হুট করে গাধা বলবেন না।'

'সরি, আর বলব না।'

'বিয়েতে সাক্ষী লাগবে না?'

'সাক্ষী নিয়ে তুমি চিন্তা করবে না তুমি চলে এসো।'

'কোথায় চলে আসব?'

'মগবাজার কাজি অফিসে চলে আসো। বাদল সেখানেই তোমার জন্যে অপেক্ষা করছে।'

'আপনি পাগলের মতো কথা বলছেন কেন? মিঃ রেইন শুধু শুধু মগবাজার কাজি অফিসে বসে থাকবে কেন?'

'বাদল সেখানে আছে, কারণ আমি তাকে সেখানে পাঠিয়ে তারপর তোমাকে টেলিফোন করেছি। আমি নিশ্চিত ছিলাম তোমার সঙ্গে কথা বললেই তুমি আমার প্রস্তাবে রাজি হবে।'

• • •

'হিমু সাহেব, শুনুন । নিজের উপর এত বিশ্বাস রাখবেন না। আমি আপনার প্রতিটি কথায় তাল দিয়ে গেছি দেখার জন্যে যে আপনি কতদূর যেতে পারেন।'

'তুমি তা হলে কাজি অফিসে আসছ না?'

'অবশ্যই না। এবং আমি আপনার প্রতিটি মিথ্যা কথাও ধরে ফেলেছি।'

'কোন কোন মিথ্যা ধরলে?'

'এই যে আপনি বললেন, মিঃ রেইন মগবাজার কাজি অফিসে বসে আছে।'

'কীভাবে ধরলে?'

'এখন ধরিনি। তবে ধরব । মগবাজার কাজি অফিস আমাদের বাসা থেকে দুমিনিটের পথ । আমি এক্ষুনি সেখানে যাচ্ছি।'

'শুধু দেখার জন্যে বাদল সেখানে আছে কি না?'

'হ্যাঁ।'

খট করে শব্দ হলো। আঁখি টেলিফোন রেখে দিল । আমি মনে মনে হাসলাম । বাদলকে আমি আসলেই কাজি অফিসে পাঠিয়ে দিয়েছি। সে একা না, সঙ্গে দুজন সাক্ষীও আছে। মোফাজ্জল এবং জহিরুল ।

ওদের জন্যে সুন্দর একটা বাসরঘরের ব্যবস্থা করতে হয়। সবচে ভালো হতো রাতটা যদি তারা দুজনে গাছের নিচে কাটাতে পারত। সেটা সম্ভব না। গল্পে-উপন্যাসে গৃহবিতাড়িত তরুণ-তরুণীর গাছতলায় জীবন কাটানোর কথা পাওয়া যায়। বাস্তব গল্প-উপন্যাসের মতো নয়।

রাত দশটায় ফুপুর বাড়িতে উপস্থিত হলাম। ঘটনা কতদূর গড়িয়েছে জানা দরকার।

বাসায় গিয়ে দেখি বিরাট গ্যাঞ্জাম। ফুপুর মাথা আইসব্যাগ চেপে ধরা আছে। পাশেই ফুপা । তিনিও রণহুংকার দিচ্ছেন। ফুপু বললেন, খবর কিছু শুনেছিস হিমু?

'কী খবর।'

• • •

‘হারমজাদটা ঐ বদ মেয়েটাকে কোর্ট ম্যারজ করেছে। ওর চামড়া ছিলে তুলে মরিচ লাগিয়ে দেয়া দরকার।’

‘কোর্ট ম্যারেজ করে ফেলেছে— বাদলের মতো নিরীহ ছেলে!’

‘নিরীহ ছেলে কি আর নিরীহ আছে? ডাইনির খপ্পরে পড়েছে না!’

ফুপা বললেন, আমিতো কল্পনাও করতে পারছি না! কী ইচ্ছা করছে জানিস হিমু?

‘না। কী ইচ্ছা করছে?’

‘ফায়ারিং স্কোয়াডে দাঁড় করিয়ে হারামজাদাটাকে গুলি করে মারতে।’

ফুপু কঠিনচোখে ফুপার দিকে তাকিয়ে বললেন, এইসব আবার কী ধরনের কথা! নিজের ছেলের মৃত্যু কামনা।

‘আহা, কথার কথা বলেছি গাধাটার তো দোষ নেই। ডাইনির পাল্লায় পড়েছে না!’

আমি বললাম, নিজের ছেলের বউকে ডাইনি বলা ঠিক হচ্ছে না। দুজনই ছেলেমানুষ, একটা ভুল করেছে...এখন উচিত ক্ষমাসুন্দর চোখে...

ফুপু গর্জন করে উঠলেন, হিমু, তুই দালালি করবি না। খবর্দার বললাম। এই বাড়ি চিরদিনের জন্যে ওদের জন্যে নিষিদ্ধ।

‘বেচারারা বাসররাতে পথে-পথে ঘুরবে!’

‘কেউ যদি জায়গা না দেয় পথে-পথে ঘোরা ছাড়া গতি কী! আঁখি বাদলকে নিয়ে তার মা’র বাড়িতে গিয়েছিল। তিনি মুখের উপর দরজা বন্ধ করে দিয়েছেন।’

‘তা তো দেবেই। বদের ঝাড় না? আমার ছেলের মুখের উপর দরজা বন্ধ করে, এতবড় সাহস! আমি এই বাড়িতেই আমার ছেলের বাসর করব।’

‘এটা মন্দ না। লাইট-ফাইট নিয়ে আসি।’

‘লাইট-ফাইট কেন?’

‘আলোকসজ্জা করতে হবে না?’

‘আলোকসজ্জা তো পরের ব্যাপার- বাসরঘর সাজাতে হবে। ফুল আনতে হবে। এত রাতে ফুল পাবি?’

• • •

‘পাব না মানে?’

ফুপু মাথার আইসব্যাগ ফেলে দিয়ে উঠে বসলেন।

ফুপার চোখ চকচক করছে। মনে হয় ছেলের বিবাহ উপলক্ষে আজ তিনি বোতল খুলবেন । তাঁর সঙ্গীর অভাব হবে না। মোফাজ্জল এবং জহিরুল বড়ির সামনেই ঘোরাঘুরি করছে। সিগন্যাল পেলেই চলে আসবে।

@@

সাদেক সাহেব শুকনোমুখে ফুপুদের বসার ঘরে বসে আছেন। তার সামনে এক কাপ চা। নাশতার প্লেটে দুপিস কেক। দেখেই মনে হচ্ছে অনেকদিনের বাসি, ছাতাপড়া । আমাকে দেখে ভদ্রলোক হতাশ গলায় বললেন, বাড়ির সবাই কোথায় গেছে জানেন?

আমি বললাম, না। যদিও সুনসান নীরবতা দেখে কিছুটা আঁচ করতে পারছিলাম। বাদল এবং আঁখি হানিমুন করতে কক্সবাজারের দিকে রওনা হয়েছে। তাদের সঙ্গে এ-বাড়ির সবাই রওনা হয়েছে। ফুপা সম্প্রতি একটা মাইক্রোবাস কিনেছেন। মাইক্রোবাস ব্যবহারের সুযোগ পাওয়া যাচ্ছিল না। এখন সুযোগ হয়েছে। হানিমুনে স্বামী-স্ত্রী একা থাকবে এটাই নিয়ম। এ-বাড়িতে সব নিয়মই উলটোদিকে চলে।

‘বাড়ির সবাই কোথায় আপনি জানেন না?’

‘জি না।’

‘ওরা সবাই কক্সবাজার চলে গেছে।’

• • •

'ও আচ্ছা।'

'কাজের ছেলেটাকে জিজ্ঞেস করে জানলাম। আমার বিশ্বাস হচ্ছিল না বলে আপনাকে জিজ্ঞেস করেছি।'

'আপনি মনে হয় কিছুটা আপসেট হয়েছেন।'

'আপসেট হওয়া কি যুক্তিযুক্ত নয়? আপনার ফুপুর ঠেলাঠেলিতে মামলার সমস্ত ব্যবস্থা করে চারজনকে আসামি দিয়ে মামলা দায়ের করে বাসায় এসে শুনি সবাই কক্সবাজার ।'

'মামলা দায়ের হয়েছে?'

'অবশ্যই হয়েছে। পাঁচজন সাক্ষী জোগাড় করেছি। এর মধ্যে মারাত্মক আহত আছে দুজন। দুজনই হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। আসামি করেছি তিনজনকে- মেয়ের বাবা মেয়ের বড়মামা আর মেজোমামা। আজই ওয়ারেন্ট ইস্যু হবে।'

'আপনি তো ভাই খুবই করিৎকর্মা মানুষ। ডায়নামিক পার্সোনিলিটি।'

প্রশংসায় সাদেক সাহেব খুশি হলেন না। তিনি আরও মিইয়ে গেলেন। বাসি কেক কচকচ করে খেয়ে ফেললেন।

'হিমু সাহেব!'

'জি?'

'আমার অবস্থাটা চিন্তা করুন। যাদের নামে মামলা করেছি তারা ফরিয়াদিদের সঙ্গে মিলিমিশে মেয়ে এবং মেয়ের জামাই-এর সঙ্গে হানিমুনে চলে গেছে।'

'ঐ পার্টিও গেছে নাকি?'

'জি, তারাও গিয়েছে। আমি এখান থেকে টেলিফোন করে জেনেছি। তারা আরেকটা মাইক্রোবাস ভাড়া করেছে।'

'বাহ, ভালো তো!'

সাদেক সাহেব রেগে গেলেন। হতভম্ব গলায় বললে, ভালো তো মানে? ভালো তো বলছেন কেন?'

• • •

‘কিছু ভেবে বলছি না, কথার কথা বলছি।’

‘আমার অবস্থাটা আপনি চিন্তা করছেন?’

‘আসলে মামলার কথাতে নেচে ওঠাটা আপনার ঠিক হয়নি। সবুর করা উচিত ছিল। সবুরে “ফুট” ফলে বলে একটা কথা আছে। সবুর করলে আপনাকে এই ঝামেলায় যেতে হতো না। ফ্রুট ফলত, আপনিও মাইক্রোবাসে করে হানিমুন পার্টিতে শামিল হতে পারতেন।’

‘রসিকতা করছেন?’

‘রসিকতা করছি না।’

‘দয়া করে রসিকতা করবেন না। রসিকতা আমার পছন্দ না। আমি সিরিয়াস ধরনের মানুষ।’

‘চা খাবেন?’

‘না, চা খাব না। আচ্ছা দিতে বলুন। আমার মাথা আউলা হয়ে গেছে, এখন করবটা কী বলুন তো?’

‘সাজেশান চাচ্ছেন?’

‘না, সাজেশান চাচ্ছি না। আমি অন্যের সাজেশানে চলি না।’

‘না চলাই ভালো। ফুপুর সাজেশান শুনে আপনার অবস্থাটা কী হয়েছে দেখুন। পুরোপুরি ফেঁসে গেছেন।’

সাদেক সাহেব সিগারেট ধরালেন । বেচারাকে দেখে সত্যি সত্যি মায়া লাগছে।

‘সাদেক সাহেব!’

‘জি?’

‘আপনি মন-খারাপ করবেন না। আমি আছি আপনার সঙ্গে।’

‘আপনি আমার সঙ্গে আছেন মানে কী?’

‘ওরা যা ইচ্ছা করুক। ওদের মিল-মহব্বতের আমরা তোয়াক্কা করি না। আমরা আমাদের মতো মামলা চালিয়ে যাব ।’

• • •

‘আবার রসিকতা করছেন?’

‘ভাই, আমি মোটেই রসিকতা করছি না। আমি সিরিয়াস। আঁখির বাবা এবং দুই মামাকে আমরা হাজতে ঢুকিয়ে ছাড়ব। পুলিশকে দিয়ে রোলারের ডলা দেওয়াব। কানে ধরে উঠবোস করাব।’

‘হিমু সাহেব। আপনার কি মাথা খারাপ? আপনি উন্মাদ?’

‘আমি উন্মাদের মতো কথা বলছি?’

‘অবশ্যই বলছেন।’

‘তা হলে আরেকটা সাজেশান দিই। আপনি নিজেও কক্সবাজার চলে যান। আসামি ফরিয়াদি দুই পার্টিকেই একসঙ্গে ট্যাকল করুন। দুপার্টিই আপনার চোখের সামনে থাকবে। আপনি বিচক্ষণ আইনবিদ। আইনের প্যাচে ফেলে হালুয়া টাইট করে দিন। ওরা বুঝুক হাউ মেনি প্যাডি, হাউ মেনি রাইস।’

‘শুনুন হিমু সাহেব, আপনি আপনার মাথার চিকিৎসা করাবার ব্যবস্থা করুন। ইউ আর এ সিক পারসন।’

‘আপনার চায়ের কথা বলা হয়নি। দাঁড়ান, চায়ের কথা বলে এসে আপনার সঙ্গে জমিয়ে আডডা দেব।’

সাদেক সহেব উঠে দাড়ালেন এবং আমাকে দ্বিতীয় বাক্য বলার সুযোগ না দিয়ে বের হয়ে গেলেন। সাহিত্যের ভাষায় যাকে বলে— ঝড়ের বেগে নিস্ক্রমণ।

ফুপুর কাজের ছেলে রশিদ আমার খুব যত্ন নিল। আমাকে সে কিছুতেই যেতে দেবে না। রশিদের বয়স আঠারো-উনিশ। শরীরের বাড় হয়নি বলে এখনও বালক-বালক দেখায়। ফুপার বাড়িতে সে গত দুবছর হলো আছে। ফুপুর ধারণা রশিদের মতো এক্সপার্ট কাজের ছেলে বাংলাদেশে দ্বিতীয়টা নেই। সে একা একশো না, একাই তিনশো। কথাটা মনে হয় সত্যি।

রশিদ দাঁত বের করে বলল, আইজ আর কই ঘুরবেন, শুইয়া বিশ্রাম করেন। মাথামালিশ কইরা দিমু। দুপুরে আফনের জন্যে বিরানি পাকামু।

• • •

‘বিরানি রাঁধতে পারিস?’

‘আমি পারি না এমন কাম এই দুনিয়াতে পয়দা হয় নাই। সব কিসিমের কাম এই জীবনে করছি।’

‘বলিস কী!’

‘আমার ভাইজান আফনের মতো অবস্থা। বেশিদিন কোনো কামে মন টিকে না। চুরিধারি কইরা বিদায় হই।

‘চুরি ধারি করিস?’

‘পরথম করি না। শেষ সময়ে করি। বিদায় যেদিন নিমু তার একদিন আগে করি। ভাইজান, আফনের চুল বড় হইছে, চুল কাটবেন?’

‘নাপিতের কাজও জানিস?’

‘জানি। মডান সেলুনে এক বছর কাম করছি। কলাবাগান। ভালো সেলুন। এসি ছিল । করিগরও ছিল ভালো।’

‘নাপিতের দোকান থেকে কী চুরি করেছিলি?’

‘ক্ষুর, কেঁচি, চিরুনি, দুইটা শ্যাম্পু এইসব টুকটাক...’

‘খারাপ কী? ছোট থেকে বড়। টুকটাক থেকে একদিন ধুরুমধারুম হবে। দে, চুল কেটে দে।’

আমি হাত-পা ছড়িয়ে বারান্দায় মোড়ায় বসলাম। রশিদ মহা উৎসাহে আমার চুল কাটতে বসল।

‘মাথা কামাইবেন ভাইজান?’

‘মাথা-কামানোর দরকার আছে?’

‘শখ হইলে বলেন। মাতাকামানিটা হইল শখের বিষয়।’

মাথা কামাতে তোর যদি আরাম লাগে তা হলে কামিয়ে দে। সমস্যা কিছু নেই। আমার মাথায় চুল থাকাও যা, না-থাকাও তা।’

• • •

রশিদ গম্ভীরমুখে বলল, লোকের ধারণা মাথা-কামানি খুব সহজ। আসলে কিন্তু ভাইজান বড়ই কঠিন কাজ ।

আমি গভীর গলায় বললাম, জগতের যাবতীয় কঠিন কাজই আপাতদৃষ্টিতে খুব সহজ মনে হয়। সহজ কাজকে মনে হয় কঠিন। যেমন ধর সত্য কথা বলা। মনে হয় না খুব সহজ, ইচ্ছা করলেই পারা যাবে? আসলে ভয়ংকর কঠিন। যে-মানুষ একমাস কোনো মিথ্যা না বলে শুধুই সত্যিকথা বলবে, ধরে নিতে হবে সে একজন মহামানব।

'ভাইজান!'

'বল।'

'আফনের সঙ্গে আমার একটা প্রাইভেট কথা ছিল।'

'বলে ফ্যাল।'

'আফনের কাছে আমি একটা জিনিস চাই ভাইজান— আফনে না বলতে পারবেন না।'

'কী জিনিস চাস?'

'সেইটা ভাইজান পরে বলতেছি । আগে আফনে ওয়াদা করেন দিবেন।'

'তুই চাইলেই আমি দিতে পারব এটা ভাবলি কী করে?'

'আফনে মুখ দিয়া একটা কথা বললেই সেইটা হয়- এইটা আমরা সবেই জানি।'

'তোকে বলেছে কে?'

'বলা লাগে না ভাইজান। বুঝা যায়। তারপরে বাদল ভাই বলছেন। বাদল ভাইয়ের বিবাহ গেছিল ভাইঙ্গা। বাদল ভাই আফনেরে বলল- সঙ্গে সঙ্গে সব ঠিক।'

'তুই চাস কী?'

'বিদেশ যাইতে খুব মন চায় ভাইজান । দেশে মন টিকে না।'

'আচ্ছা যা, হবে।'

• • •

রশিদ মাথা-কামানো বন্ধ করে তৎক্ষণাৎ আমার পা ছুয়ে ভক্তিভরে প্রণাম করল । আমি সিদ্ধপুরুষদের মতোই তার শ্রাদ্ধ গ্রহন করলাম। মানুষকে ভক্তি করতে ভালো লাগে না- মানুষের ভক্তি পেতে ভালো লাগে।

আমার মাথা-কামানো হলো । মাথা-ম্যাসেজ করা হলো । গা-মালিশ করা হলো । দুপুরে হেভি খানাপিনা হলো। খাসির বিরিয়ানি, মুরগির রোস্ট। অতি সুস্বাদু রান্না, ভরপেট খাবার পরেও মনে হচ্ছে আরও খাই ।

'রশিদ, তুই তো ভালো রান্না জানিস!'

'চিটাগাং হোটেলে বাবুর্চির হেল্পার ছিলাম ভাইজান। বাবুর্চির নাম ওস্তাদ মনা মিয়া। এক লম্বর বাবুর্চি ছিল। রান্ধনের কাজ সব শিখছি ওস্তাদের কাছে।'

'ভালো শিখেছিস। খুব ভালো শিখেছিস।'

'রাইতে ভাইজান আফনেরে চিতলমাছের পেটি খাওয়ামু। এইটা একটা জিনিস?'

'কি রকম জিনিস?'

'একবার খাইলে মিত্যুর দিনও মনে পড়ব। আজরাইল যখন জান-কবচের জন্যে আসব তখন মনে হইব- আহারে, চিতলমাছের পেটি। ওস্তাদ মনা মিয়া আমারে হাতে ধইরা শিখাইছে। আমারে খুব পিয়ার করত।'

'ওস্তাদের কাছ থেকে কী চুরি করলি?'

রশিদ চুপ করে রইল। আমি আর চাপাচাপি করলাম না। দুপুরে লম্বা ঘুম দিলাম। রাতে খেলাম বিখ্যাত চিতলমাছের পেটি। সেই রান্না শিল্পকর্ম হিসেবে কতটা উত্তীর্ণ বলতে পারলাম না— কারণ শুরুতেই গলায় কাঁটা বিঁধে গেল। মাছের কাঁটা খুবই তুচ্ছ ব্যাপার, কিন্তু একে অগ্রাহ্য করা যায় না। প্রতিনিয়তই সে জানান দিতে থাকে। আমি আছি। আমি আছি। আমি আছি ঢোক গেলার প্রয়োজন নেই, তার পরেও ক্রমাগত ঢোক গিলে যেতে হয়। কাঁটার প্রসঙ্গে আমার বাবার কথা মনে পড়ল। তার বিখ্যাত বাণীমালায় কাঁটাসংক্রান্ত বাণীও ছিল।

কণ্টক

• • •

কাঁটা, কণ্টক, শলা, তরুনখ, সূচী, চোঁচ

"বাবা হিমালয়, শৈশবে কইমাছের ঝোল খাইতে গিয়া একবার তোমার গলায় কইমাছের কাঁটা বিঁধিল । তুমি বড়ই অস্থির হইলে । মাছের কাঁটার যন্ত্রণা তেমন অসহনীয় নয়, তবে বড়ই অস্বস্তিকর। কণ্টক নীরবেই থাকে, তবে প্রতিনিয়তই সে তার অস্তিত্ব স্মরণ করাইয়া দেয়। কন্টকের এই কোনো ব্যবস্থা করি নাই। তুমি কিছুদিন গলায় কাঁটা নিয়া ঘুরিয়া বেড়াইলে । বাবা হিমালয়, তুমি কি জান যে মানুষের মনেও পরম করুণাময় কিছু কাঁটা বিধাইয়া দেন? একটি কাঁটার নাম-মন্দ কাঁটা । তুমি যখনই কোনো মন্দ কাজ করিবে তখনই এই কাটা তোমাকে স্মরণ করাইয়া দিবে। তুমি অস্বস্তি বোধ করিতে থাকিবে। ব্যথা বোধ না-অস্বস্তিবোধ ।

সাধারণ মানুষদের জন্য এইসব কাঁটার প্রয়োজন আছে। সিদ্ধপুরুষদের জন্য প্রয়োজন নাই। কাজেই কণ্টকমুক্তির একটা চেষ্টা অবশ্যই তোমার মধ্যে থাকা উচিত। যেদিন নিজেকে সম্পূর্ণ কণ্টকমুক্ত করিতে পারবে সেইদিন তোমার মুক্তি। বাবা হিমালয়, প্রসঙ্গক্রমে তোমাকে একটা কথা বলি, মহাপাষণ্ডরাও কণ্টকমুক্ত। এই অর্থে মহাপুরুষ এবং মহাপাষণ্ডের ভিতরে তেমন কোনো প্রভেদ নাই।"

গলায় কাঁটা নিয়ে রাতে আশরাফুজ্জামান সাহেবের সঙ্গে দেখা করতে গেলাম। ভদ্রলোক মনে হচ্ছে কোনো ঘোরের মধ্যে আছেন। আমার মুণ্ডিত মস্তক তার নজরে এল না। তিনি হাসিমুখে এসে আমাকে জড়িয়ে ধরলেন।

'ভাইসাহেব, আমি আপনার জন্যেই অপেক্ষা করছিলাম। আমি জানতাম আজ আপনি আসবেন।'

'আজ কি বিশেষ কোনো দিন?'

• • •

‘জি। আজ আমার মেয়ের পানচিনি হয়ে গেছে।’

‘বলেন কী।’

‘কী যে আনন্দ আমার হচ্ছে ভাই! একটু পরপরই চোখে পানি এসে যাচ্ছে।’

তিনি চোখ মুছতে লাগলেন। চোখ মনে হয় অনেকক্ষণ ধরেই মুছছেন। চোখ লাল হয়ে আছে। আমি বললাম, আপনার মেয়ে কোথায়? এত বড় উৎসব, বাসা খালি কেন?

‘মেয়ে খুব কান্নাকাটি করছিল। আমার কান্না দেখেই কাঁদছিল। শেষে তার মামাতো ভাইবোনরা এসে নিয়ে গেছে। আমাকেও নিতে চাচ্ছিল, আমি যাইনি।’

‘যাননি কেন?’

ইয়াসমিন একা থাকবে। তা ছাড়া মেয়ের বিয়ে নিয়ে তার সঙ্গে একটু কথাবার্তা বলব। আমার দায়িত্ব এখন শেষ।’

‘ওনার দায়িত্বও তো শেষ। মেয়েকে আর চোখে-চোখে রাখতে হবে না। উনি আবার মেয়ের শ্বশুরবাড়িতে গিয়ে উপস্থিত হবেন না তো? জীবিত শ্বাশুড়িকেই জামাইরা দেখতে পারে না- উনি হলেন ভূত-শ্বাশুড়ি।’

আশরাফুজ্জামান সাহেব করুণ গলায় বললেন, আমার স্ত্রী সম্পর্কে এই জাতীয় বাক্য ব্যবহার করবেন না ভাই। আমি মনে খুব কষ্ট পাই ।

‘আচ্ছা যান, আর করব না।’

‘ভাই, আজ রাতটা আপনি আমার সঙ্গে থেকে যান। দুজনে গল্পগুজব করি।’

‘আমি থাকলে আপনি আপনার স্ত্রীর সঙ্গে কথা বলবেন কীভাবে?’

‘ওর সঙ্গে তো সারাক্ষণ কথা বলি না। কথাবার্তা সামান্যই হয় । ওর কথা বলতে কষ্ট হয়।’

‘ও আচ্ছা।’

‘হিমু সাহেব! ভাই আমার অনুরোধটা রাখুন। থাকুন আমার সঙ্গে। বিছানায় ধোয়া চাদর দিয়ে দিচ্ছি।’

• • •

‘চাদর-ফাদর কিছু লাগবে না। একটা বিড়াল লাগবে। আপনার বাসায় কি বিড়াল আছে?’

‘জি না, বিড়াল লাগবে কেন?’

‘আমার গলায় কাঁটা ফুটেছে। বিড়ালের পা ধরলে নাকি গলার কাঁটা যায়...’

‘এইসব কথা একদম বিশ্বাস করবেন না। এসব হচ্ছে কুসংস্কার। গরম লবণপানি দিয়ে গার্গল করেন, গলার কাঁটা চলে যাবে। আমি গরম পানি এনে দিচ্ছি। গলার কাঁটার খুব ভালো হোমিওপ্যাথি অষুধ আছে। কাল সকালে আমি আপনাকে জোগাড় করে দেব- অ্যাকোনইট ৩।’

‘আপনি তা হলে হোমিওপ্যাথিও জানেন?’

‘ছোট বাচ্চা মানুষ করেছি, হোমিওপাথি তো জানতেই হবে। বই পড়ে পড়ে শিখেছি, স্বআহৃত জ্ঞান। আপনার যদি দীর্ঘদিনের কোনো ব্যাধি থাকে বলবেন, চিকিৎসা করব। তখন বুঝতে পারবেন যে আমি আসলে একজন ভালো চিকিৎসক।’

‘ভয়-পাওয়া রোগ সারাতে পারবেন?’

‘ভয়-পাওয়া রোগ? আপনি ভয় পান?’

‘একবার পেয়েছিলাম। সেই ভয়টা মনে গেঁথে ক্রনিক হয়ে গেছে। কিংবা এমনও হতে পারে- পাগল হয়ে যাচ্ছি।’

‘এই দুটি রোগেরই হোমিওপ্যাথিতে খুব ভালো চিকিৎসা আছে। ভূত-প্রেত দেখতে পেলে স্ট্রামোনিয়াম ৬, আর যদি মনে হয় পাগল হয়ে যাচ্ছেন তা হলে খেতে হবে প্ল্যাটিনা ৩০, দুটাই মানসিক অসুখ।’

‘মনে হচ্ছে হোমিওপ্যাথিতে মানসিক রোগের ভাল চিকিৎসা আছে।’

‘অবশ্যই আছে। যেমন ধরুন কেউ যদি মনে রে সব বিষয়ে তার টনটনে জ্ঞান তাকে দিতে হবে কফিয়া ৬, অনবরত কথা-বলা রোগের জন্যে ল্যঅকেসিস ৬, লোকের সঙ্গ বিরক্তি এলে নাস্কভমিকা ৩, উদাসীন ভাব অ্যাসিড ফস-৩, খুন করার ইচ্ছা জাগলে

হায়াসায়েমাস ৩, আত্মহত্যা করার ইচ্ছা- অরাম সেট ৩০, কথা বলার সময় কান্না পেলে- পালস ৬, অতিরিক্ত ধর্মচিন্তা- নাক্সভমিকা।'

'অতিরিক্ত কথা বলার ইচ্ছা কমে কোন অষুধে বললেন?'

'ল্যাকেসিস ৬।'

'ঘরে আছে না?'

'জি আছে। গলার কাঁটার অষুধটা নেই। এইটা আছে।'

'আপনার তো মনে হয় ল্যাকেসিস ৬ অষুধটা নিয়মিত খাওয়া উচিত।'

'হিমু সাহেব, আমি কিন্তু কথা কম বলি। কথা বলার মানুষই পাই না- কথা বলব কী করে? আমার মেয়ে তো আমার সঙ্গে কথা বলে না। যখন ছোট ছিল তখন বলত। এখন যতই দিন যাচ্ছে ততই সে দূরে সরে যাচ্ছে। কথা কম-বলা রোগেরও ভালো হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা আছে- অ্যাসিড ফস ৬, উদাসীন ভাবের জন্যে অ্যাসিড ফস ৩, আর কথা কম-বলা রোগের জন্যে অ্যাসিড ফস ৬, কিন্তু আমার অষুধ খাবে না। ওর ধারণা হোমিওপ্যাথি হলো চিনির দলা । কোনো-একটা বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবার আগে পরীক্ষা করে দেখতে হয়। পরীক্ষা না করেই কেউ যদি বলে চিনির দলা, সেটা কি ঠিক?'

'জি না, ঠিক না।'

'আমাদের নিয়ম হচ্ছে পরীক্ষা ছাড়াই সিদ্ধান্ত । খারাপ না?'

'খুবই খারাপ।'

'আমি কথা বেশি বলায় বিরক্ত হবেন না। অনেকদিন পর আপনাকে পেয়েছি বলে এত কথা বলছি। আপনি তো আর সাধারণ মানুষের মতো না যে আপনার সঙ্গে মেপে মেপে কথা বলতে হবে!'

'আমি সাধারণ মানুষের মতো না?'

'অবশ্যই না। ঐদিন আপনি আমার কন্যার বাড়ি ফেরা সম্পর্কে যে-সময় বলে গিয়েছিলেন, সে ঠিক সেই সময় ফিরেছে। আমি খুবই বিস্মিত হয়েছিলাম। অ্যাজ এ

ম্যাটার অভ ফ্যাক্ট আমার বিস্ময়ভাব এখনও যায়নি। প্রচণ্ড আধ্যাত্মিক ক্ষমতাসম্পন্ন মানুষ তো আর আজকাল পাওয়া যায় না। যাদের এই ক্ষমতা আছে তারা তা প্রকাশ করেন না। তারা আড়ালে থাকতেই পছন্দ করেন। আপনার সঙ্গে নিশ্চয়ই অনেকের যোগাযোগ আছে । আপনি যদি দয়া করে এমন লোকের সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দেন তা হলে খুব খুশি হবো। আছে এমন কেউ?'

'আছে একজন— ময়লা-বাবা । গায়ে ময়লা মেখে বসে থাকেন।'

'ময়লা মেখে বসে থাকে কেন?'

'বলতে পারব না। জিজ্ঞেস করিনি।'

জিজ্ঞেস করেননি কেন?'

'জিজ্ঞেস করিনি কারণ তাঁর সঙ্গে আমার দেখা হয়নি। তাঁর ঠিকানা জোগাড় করেছি। একদিন যাব।'

'হিমু সাহেব ভাই, যেদিন যাবেন অবশ্যই আমাকে নিয়ে যাবেন। ওনার ক্ষমতা কেমন?'

'লোকমুখে শুনেছি ভালো ক্ষমতা। মনের কথা হড়বড় করে বলে দেন। আপনার মনে কোনো খারাপ কথা থাকলে ওনার সঙ্গে দেখা না করাই ভালো। হড়বড় করে বলে দেবেন, আপনি পড়বেন লজ্জায়।'

'ওনার নাম কী বললেন, ময়লা-বাবা?'

'জি, ময়লা-বাবা।'

'কী ধরনের ময়লা গায়ে মাখেন?'

'এক-তৃতীয়াংশ নর্দমার পানির সঙ্গে এক-তৃতীয়াংশ ডাস্টবিনের ময়লা, একষষ্ঠমাংশ টাটকা গু প্লাস আরও কিছু হাবিজাবি দিয়ে সেমি সলিড একটা মিকশ্চার তৈরি করে তেলের মতো গায়ে মেখে ফেলেন।'

'সত্যি?'

• • •

'ভাই আমি রসিকতা করছি। সত্যি কি না এখনও জানি না । দেখা হলে জানব । ময়লার ফর্মুলা নিয়ে আসব। ইচ্ছা করলে আপনিও গায়ে মাখতে পারেন।'

একজন মানুষ যে অন্য একজনকে কী পরিমাণ বিরক্ত করতে পারে আমি আশরাফুজ্জামান সাহেবের সঙ্গে রাত কাটিয়ে এই তথ্য জেনে গেলাম।

আমি পা গুটিয়ে বিছানায় বসে আছি। তিনি বসে আছেন আমার সামনে একটা বেতের চেয়ারে। তিনি ননস্টপ কথা বলে যাচ্ছেন। ঢাকা-চিটাগাং আন্তনগর ট্রেনও কিছু স্টেশনে থামে। উনি কোনো স্টেশনই ধরছেন না। ছুটে চলছে তুফান মেইল । তার সব গল্পই তার কন্যা এবং ভূত-স্ত্রী প্রসঙ্গে। আমি শুনে যাচ্ছি- মন দিয়েই শুনছি। অন্যের কথা মন দিয়ে শোনার বিদ্যা আমার ভালোই আয়ত্ত হয়েছে।

'বুঝলেন হিমু ভাই, আজ আমি একজন মুক্ত মানুষ। এ ফ্রী ম্যান। মানে এখনও ফ্রী না, তবে হয়ে যাচ্ছি। যেদিন আমার মেয়ে শ্বশুরবাড়ির দিকে রওনা হবে, সেদিনই আমি হবো একজন স্বাধীন মানুষ। মেয়েটা সুন্দর হওয়ায় নানান সমস্যা হচ্ছিল । কলেজে ওঠার পর থেকে শুধু বিয়ের সম্বন্ধ আসে। শুধু সম্বন্ধ এলে ক্ষতি ছিল না। তারা নানানভাবে চাপাচাপি করে। ভয় পর্যন্ত দেখায় এমন অবস্থা বিয়ে না দিলে মেয়ে উঠিয়ে নিয়ে চলে যাব, এই জাতীয় কথাবার্তা পর্যন্ত বলে। শুধু যে ওরা চাপাচাপি করেছে তাই না, আমার আত্মীয়স্বজনরাও চাপাচাপি করেছে। আমি একা মানুষ, মেয়ে মানুষ করতে পারছি না- এইসব উদ্ভট যুক্তি। যখন বিয়ে দিতে মন ঠিক করলাম তখন অন্য সমস্যা। বিয়ের সব ঠিকঠাক হয়, ছেলে পছন্দ হয়, কথাবার্তা পাকা হয়, তখন বিয়ে ভেঙে যায়। ক'বার এরকম হলো জানেন? পাঁচবার । এর মধ্যে তিনবার বিয়ের কার্ড পর্যন্ত ছাপা হয়ে গিয়েছিল। আপনাকে কার্ড দেখাব। সব যত্ন করে রেখে দিয়েছি।'

'বিয়ে ভেঙে যায় কেন?'

'দুষ্ট লোকেরা কানভাঙানি দেয়। আমার মেয়ের নামে আজেবাজে কথা বলে, উড়ো চিঠি দেয়। টেলিফোন করে। সুন্দরী মেয়েদের প্রসঙ্গে আজেবাজে ধরনের কথা মানুষ খুব সহজে বিশ্বাস করে । বিয়ে ভেঙে যায়। আমার মেয়ে এতে খুব কষ্ট পায়। আমি

তেমন পাই না, কারণ আমার স্ত্রী আগেই আমাকে জানিয়ে দেয় বিয়ে ভেঙে যাবে। আমার ভেতর একধরনের মানসিক প্রস্তুতি থাকে। কিন্তু আমার মেয়ের ভেতর থাকে না বলে সে খুব কষ্ট পায়। বিয়ে হচ্ছে না এইজন্যে কষ্ট না, অপমানের কষ্ট।'

'কষ্ট হবারই কথা।'

'তারপর সে ঠিক করল কোনোদিন বিয়েই করবে না। কঠিনভাবে আমাদের সবাইকে বলল, তার বিয়ে নিয়ে আর একটি কথাও যেন না বলা হয়। আমার মেয়ে আবার খুব কঠিন ধরনের- একবার যা বলবে তা-ই। এর কোনো নড়চড় হবে না। আমরা বিয়ে নিয়ে কথাবার্তা দীর্ঘদিন বলিনি। এতদিন পর হঠাৎ আবার কথা উঠল। অতিদ্রুত সব ফাইনাল হয়ে গেল।'

'ভালো তো!'

'ভালো তো বটেই! কী যে আনন্দ আমার হচ্ছে তা আপনাকে বলে বোঝাতে পারব না ।'

'আপনার স্ত্রী? তিনিও কি আপনার মতোই আনন্দিত?'

'হ্যাঁ, সেও খুশি। খুব খুশি।'

'আপনার সঙ্গে কথা হয়েছে?'

'জি, কথা হয়েছে।'

'তিনি আবার বলেননি তো যে এবারও বিয়ে ভেঙে যাবে?'

'না, বলেনি। অবিশ্যি সে ভবিষ্যতের কথা খুব আগেভাগে বলতে পারে না। শেষমুহূর্তে বলে। কে জানে এইবারও শেষমুহূর্তে কিছু বলে কি না।'

'শেষমুহূর্তে কিছু বলার সুযোগ না দিলেই হয়। বিয়ের কথাবার্তা পাকা হবে, সঙ্গে সঙ্গে বিয়ে হয়ে যাবে। ধরো তক্তা মারো পেরেক অবস্থা। কেউ ভাঙনি দেবার সুযোগ পাবে না ।'

• • •

‘তা কি আর হয়! মেয়ের বিয়ে বলে কথা! এ তো আর চাইনিজ রেস্টুরেন্টে ডিনার খাওয়ার মতো ঘটনা না যে রাত আটটায় ঠিক করা হবে রাত ন’টায় খেতে যাওয়া হবে!’

‘তাও ঠিক।’

‘মেয়ের ছবি দেখবেন?’

‘নিশ্চয়ই দেখব।’

‘সব ছবি দেখতে সময় লাগবে ।শত শত ছবি আমি তুলেছি। একসময় ফটোগ্রাফির শখ ছিল। এখনও আছে। নিয়ে আসব?’

‘আনুন।’

‘সব মিলিয়ে পঁচিশটা অ্যালবাম।’

‘পঁচিশটা অ্যালবাম!’

‘জি, একেক বছরের জন্যে একেকটা। আসুন আলবাম দেখি। আমি মেয়েকে বলেছি, মা শোন, এই বাড়ি থেকে তুই সবকিছু নিয়ে যা, শুধু অ্যালবামগুলি নিতে পারবি না।’

আমরা অ্যালবাম দেখা শুরু করলাম। ছবির উপর দিয়ে শুধু যে চোখ বুলিয়ে যাব সে-উপায় নেই- প্রতিটি ছবি আশরাফুজ্জামান সাহেব ব্যাখ্যা করছেন-

‘যে-ফ্রকটা পরা দেখছেন, তার একটা সাইড ছেঁড়া আছে। মীরার খুব প্রিয় ফ্রক। ছিঁড়ে গেছে, তার পরেও পরবে। থুতনিতে কাটা দাগ দেখতে পাচ্ছেন না? বাথরুমে পা পিছলে পড়ে ব্যথা পেয়েছিল। রক্তারক্তি কাণ্ড। বাসায় গাদাফুল ছিল। সেই ফুল কচলে দিয়ে রক্ত বন্ধ করেছে।’

আমরা ভোর চারটা পর্যন্ত সাতটা অ্যালবাম শেষ করলাম। অষ্টম অ্যালবাম হাতে নিয়ে বললাম, আশরাফুজ্জামান সাহেব, কাপড় পরুন তো!

তিনি চমকে উঠে বললেন, কেন?

আমি বললাম, আমার ধারণা আপনার কন্যার বিয়ে হয়ে গেছে।

• • •

'কী বলছেন এসব?'

'মাঝে মাঝে আমি ভবিষ্যৎ বলতে পারি।'

আশরাফুজ্জামান সাহেব কিছুক্ষণ হতভম্ব হয়ে তাকিয়ে থেকে নিঃশব্দে উঠে গিয়ে পাঞ্জাবি গায়ে দিলেন ।

আমরা ভোর পাঁচটায় ধানমণ্ডিতে মেয়ের মামার বাড়িতে পৌছলাম। দেখা গেল আসলেই মীরার বিয়ে হয়ে গেছে। রাত দশটায় কাজি এনে বিয়ে পড়ানো হয়েছে।

আমি বলরাম, মেয়ের বাবাকে না জানিয়ে বিয়ে, ব্যাপারটা কী?

মেয়ের মামা আমাকে আড়ালে ডেকে নিয়ে বললেন, আপনি বাইরের মানুষ, আপনাকে কী বলব, না বলেও পারছি না- মেয়ের বিয়ে ভেঙে যেত তার বাবার কারণে। উনিই পাত্রপক্ষকে উড়ো চিঠি দিতেন। টেলিফোনে নিজের মেয়ের সম্পর্কে আজেবাজে কথা বলে বিয়ে ভাঙতেন। বিয়ের পর মেয়ে তাকে ছেড়ে চলে যাবে এটা সহ্য করতে পারতেন না। উনি খানিকটা অসুস্থ। আমরা যা করেছি উপায় না দেখেই করেছি।

আশরাফুজ্জামান সাহেব দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাঁদছেন। আমি তাকে রেখে নিঃশব্দে চলে এলাম। সকালবেলায় হাঁটার অন্যরকম আনন্দ ।

@@

ময়লা-বাবার আস্তানা কুড়াইল গ্রামে। বুড়িগঙ্গা পার হয়ে রিকশায় দু-কিলোমিটার যেতে হয়। তারপর হন্টন। কাঁচা রাস্তা ক্ষেতের আইল সব মিলিয়ে আরও পাঁচ কিলোমিটার। মহাপুরুষদের দেখা পাওয়া সহজ ব্যাপার না।

• • •

‘বাবা’ হিসেবে তার খ্যাতি এখনও বোধহয় তেমন ছড়ায়নি। অল্পকিছু ভক্ত উঠোনে শুকনোমুখে বসে আছে। উঠোনে চাটাই পাতা, বসার ব্যবস্থা। উঠোন এবং টিনের বারান্দা সবই পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন। যে-বাবা সারাগায়ে ময়লা মেখে বসে থাকেন তার ঘরদুয়ার এমন ঝকঝকে কেন- এই প্রশ্ন সঙ্গত কারণেই মনে আসে।

আমার পাশে একজন হাঁপানির রোগী। টেনে টেনে শ্বাস নিচ্ছে। দেখে মনে হয় সময় হয়ে এসেছে, চোখমুখ উলটে এক্ষুনি ভিরমি খাবে। আমি তাতে বিভ্রান্ত হলাম না । হাঁপানি রোগীকে যত সিরিয়াসই দেখাক এরা এত সহজে ভিরমি খায় না। রোগী আমার দিকে চোখ-ইশারা করে বললেন, বাবার কাছে আইছেন?

আমি বললাম, হ্যাঁ।

‘আপনার সমস্যা কী?’

‘সমস্যা কিছু না, ময়লা-বাবাকে দেখতে এসেছি। আপনি রোগ সারাতে এসেছেন?’

‘জি।’

‘বাবার কাছে এই প্রথম এসেছেন?’

‘জি।’

‘আর কোনো বাবার কাছে যাননি? বাংলাদেশে তো বাবার অভাব নেই।’

‘কেরামতগঞ্জের ন্যাংটা বাবার কাছে গিয়েছিলাম।’

‘লাভ হয়নি?’

‘বাবা আমার চিকিৎসা করেন নাই।’

‘ইনি করবেন?’

‘দেখি, আল্লাহপাকের কী ইচ্ছা।’

রোগীর হাঁপানির টান বৃদ্ধি পেল। আমি চোখ অন্যদিকে ফিরিয়ে নিলাম। মানুষের কষ্ট দেখা কষ্টের । হাঁপানি রোগীর দিকে বেশিক্ষণ তাকিয়ে থাকলে সুস্থ মানুষেরও নিশ্বাসের কষ্ট হয় ।

• • •

সকাল এগারোটার মতো বাজে। বাবার দেখা নেই। উঠোনে রোদ এসে পড়েছে। গা চিড়বিড় করছে। ভক্তের সংখ্যা বাড়ছে। বাবার খাদেমদের তৎপরতা চোখে পড়ছে। তারা ছেলেদের এক জায়গায় বসাচ্ছে, মেয়েদের এক জায়গায় বসাচ্ছে। সবারই উঠোনে চাটাইয়ে বসতে হচ্ছে, তবে চাটাইয়ের মাঝামাঝি চুনের দাগ দেয়া । এই দাগ আগে চোখে পড়েনি। চোখে সুরমা-দেয়া মেয়ে-মেয়ে চেহারার এক খাদেমকে নিচুগলায় বললাম, ময়লা-বাবা টাকাপয়সা কী নেন?

খাদেম বিরক্তমুখে বলল, বাবা টাকাপয়সা নেন না।

'টাকাপয়সা না নিলে ওনার চলে কীভাবে?'

'ওনার কীভাবে চলে সেটা নিয়ে আপনার চিন্তা করতে হবে না।'

'আপনাদেরও তো খরচপাতি আছে। এই যে চোখে সুরমা দিয়েছেন, সেই সুরমাও তো নগদ পয়সায় কিনতে হয়। বাবার জন্যে কিছু পয়সাকড়ি নিয়ে এসেছি, কার কাছে দেব বলেন।'

'বাবাকে জিজ্ঞেস করবেন।'

'উনি দর্শন দেবেন কখন?'

'জানি না। যখন সময় হবে উনি একজন একজন করে ডাকবেন।'

'সিরিয়ালি ডাকবেন? যে আগে এসেছে সে আগে যাবে?'

'বাবার কাছে কোনো সিরিয়াল নাই। যাকে ইচ্ছা বাবা তাকে আগে ডাকেন। অনেকে আসে বাবা ডাকেনও না।'

'আমার ডাক তো তা হলে নাও পড়তে পারে। অনেক দূর থেকে এসেছি ভাইসাহেব।'

'বাবার কাছে নিকট-দূর কোনো ব্যাপার না।'

'তা তো বটেই, নিকট-দূর হলো আমাদের মতো সাধারণ মানুষের জন্যে। বাবাদের জন্যে না।'

• • •

'আপনি বেশি প্যাচাল পাড়তেছেন। প্যাচাল পাড়বেন না, বাবা প্যাচাল পছন্দ করেন না। ঝিম ধরে বসে থাকেন। ভাগ্য ভালো হলে ডাক পাবেন।'

আমি ঝিম ধরে বসে রইলাম। আমার ভাগ্য ভালো, বাবার ডাক পেলাম। খাদেম আমার কানেকানে ফিসফিস করে বলল, বাবার হুজরাখানা থেকে বের হবার সময় বাবার দিকে পিঠ দিয়ে বের হবেন না। এতে বাবার প্রতি অসম্মান হয়। আপনার এতে বিরাট ক্ষতি হবে ।

বাবাদের হুজরাখানা অন্ধকার ধরনের হয়। ধূপ-টুপ জ্বলে। ধূপের ধোঁয়ায় ঘর বোঝাই থাকে। দরজা-জানালা থাকে বন্ধ । ভক্তকে একধরনের আধিভৌতিক পরিবেশে ফেলে দিয়ে হকচকিয়ে দেয়া হয় । এটাই নিয়ম । ময়লা-বাবার ক্ষেত্রে এই নিয়মের সামান্য ব্যতিক্রম দেখা গেল। তার হুজরাখানায় দরজা-জানালা সবই খোলা। প্রচুর বাতাস। বাবা খালিগায়ে বসে আছেন। আসলেই গা ভরতি ময়লা । মনে হচ্ছে ডাস্টবিন উপুড় করে গায়ে ঢেলে দেয়া হয়েছে। উৎকট গন্ধে আমার বমি আসার উপক্রম হলো । একী কাণ্ড! বিস্ময়কর ব্যাপার হচ্ছে বাবার চোখে সোনালি ফ্রেমের চশমা, এবং তার মুখ হাসিহাসি। কুটিল ধরনের হাসি না, সরল ধরনের হাসি। তিনি চশমার ফাঁক দিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে টানা-টানা গলায় সুর করে বললেন, কেমন আছেন গো?

আমি বললাম, ভালো।

'দুর্গন্ধ সহ্য হচ্ছে না?'

'জি না।'

'কিছুক্ষণ বসে থাকেন- সহ্য হয়ে যাবে। কিছুক্ষণ কষ্ট করেন।'

'গায়ে ময়লা মেখে বসে আছেন কেন?'

'কী করব বলেন, নাম হয়েছে ময়লা-বাবা। নামের কারণে ময়লা মাখি। গু মেখে বসে থাকলে ভালো হতো। লোকে বলত গু-বাবা । হি হি হি ।'

তিনি হাসতে শুরু করলেন। এই হাসি স্বাভাবিক মানুষের হাসি না। অস্বাভাবিক হাসি। এবং খানিকটা ভয়-ধরানো হাসি।

• • •

'আপনার নাম কী গো বাবা?'

'হিমু।'

'বাহ, ভালো নাম-সুন্দর নাম। পিতা রেখেছেন?'

'জি।'

'ভালো-অতি ভালো। গন্ধ কি এখনও নাকে লাগছে বাবা।'

'এখনও লাগছে।'

'সহ্য হয়ে যাবে। সব খারাপ জিনিসই মানুষের সহ্য হয়ে যায়। আপনার কি অসুখবিসুখ আছে?'

'না।'

'এত চট করে না বলবেন না। মানুষের অনেক অসুখ আছে যা ধরা যায় না। জ্বর হয় না, মাথা বিষ করে না- তার পরেও অসুখ থাকে। ভয়ংকর অসুখ । এই যে আমি ময়লা মেখে বসে আছি এটা অসুখ না?'

'জি, অসুখ।'

'মনের ভেতরে আমরা যখন ময়লা নিয়ে বসে থাকি তখন সেটা অসুখ না, কারণ সেই ময়লা দেখা যায় না, সেই ময়লার দুর্গন্ধ নাই। তাই না বাবা?'

'জি।'

'বাইরের ময়লা পরিষ্কার করা যায়। এখন আমি যদি গরম পানি দিয়া গোসল দেই, শরীরে সাবান দিয়া ডলা দেই– ময়লা দূর হবে। হবে না?'

'হবে।'

'মনের ময়লা দূর করার জন্যে গোসলও নাই, সাবানও নাই।'

'ঠিক বলেছেন।'

'আপনি আমার কাছে কী জন্যে এসেছেন বলেন।'

'শুনেছি আপনার আধ্যাত্মিক ক্ষমতা আছে। আপনি মানুষের মনের কথা ধরতে পারেন। সত্যি পারেন কি না দেখতে এসেছি।'

• • •

'পরীক্ষা না- কৌতুহল।'

'শুনেন বাবা, আমার কোনো ক্ষমতা নেই। ময়লা মেখে বসে থাকি বলে লোকে নানান কথা ভাবে । কেউ-কেউ কী করে জানেন? আমার গা থেকে ময়লা নিয়ে যায়। তাবিজ করে গলায় পরে— এতে নাকি তাদের রোগ আরোগ্য হয়—

ডাক্তার কবিজার গেল তল

ময়লা বলে কত জল?

হি হি হি– '

ময়লা-বাবা আবারও অপ্রকৃতিস্থের মতো হাসতে শুরু করলেন। আমি দীর্ঘনিশ্বাস ফেললাম, শুধু শুধু পরিশ্রম করেছি। মানসিক দিক দিয়ে অপ্রকৃতিস্থ একজন মানুষ। এর কাছ থেকে বেশি কিছু আশা করা ঠিক না। জ্ঞানগর্ভ কিছু কথা এরা বলে। কিংবা সাধারণ কথাই বলে- পরিবেশের কারণে সেই সাধারণ কথা জ্ঞানগর্ত কথা বলে মনে হয়।

'ময়লা নিবেন বাবা?'

'জি না।'

'ঢাকা শহর থেকে কষ্ট করে এসেছেন- কিছু ময়লা নিয়ে যান। সপ্তধাতুর কবচে ময়লা ভরবেন। কোমরে কালো ঘুনশি দিয়ে মঙ্গলবার সন্ধাবেলা শরীরে ধারন করবেন- এতে উপকার হবে।'

'কী উপকার হবে?'

'রাতে-বিরাতে যে ভয় পান সেই ভয় কমতে পারে।'

আমি মনেমনে খানিকটা চমকালাম । পাগলাবাবা কি থটরিডিং করছেন? আমার ভয় পাবার ব্যাপারটা তিনি ধরতে পেরেছেন? নাকি কাকতালীয়ভাবে কাছাকাছি চলে এসেছেন? বিস্তৃত ফাঁদ পাতা হয়েছে। আমি সেই ফাঁদে পা দিয়েছি- তিনি সেই ফাঁদ এখন গুটিয়ে আনবেন।

'ভয়ের কথা কেন বলছেন? আমি তো ভয় পাই না!'

• • •

‘রাতে কোনোদিন ভয় পান নাই বাবা?’

‘জি না।’

‘উনারে তো একবার দেখলেন । ভয় তো পাওনের কথা।’

‘কাকে দেখেছি?’

‘সেটা তো বলব না। তার হাতে লাঠি ছিল, ছিল না?’

আমি মোটামুটিভাবে নিশ্চিত হলাম ময়লা-বাবা থটরিডিং জানেন। কোনো-একটি বিশেষ প্রক্রিয়ায় তিনি আমার মনের কথা পড়তে পারছেন। এটি কি কোনো গোপন বিদ্যা- যে-বিদ্যার চর্চা শুধুই অপ্রকৃতিস্থ মানুষের মধ্যেই সীমাবদ্ধ? ময়লা-বাবাকে প্রশ্ন করলে কি জবাব পাওয়া যাবে? মনে হয় না। আমি উঠে দাঁড়ালাম। ময়লা-বাবা বললেন, বাবা কি চলে যাচ্ছেন?

আমি বললাম, হ্যাঁ।

‘পরীক্ষায় কি আমি পাশ করেছি?’

‘মনে হয় করেছেন। বুঝতে পারছি না?’

‘বুঝেছেন বাবা, আমি নিজেও বুঝতে পারি না। খুব কষ্টে আছি। দুর্গন্ধ কি এখনও পাচ্ছেন বাবা?’

‘জি না।’

‘সুগন্ধ একটা পাচ্ছেন না? সুগন্ধ পাবার কথা। অনেকেই পায়।’

আমি অত্যন্ত বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষ করলাম- সুগন্ধ পাওয়া যাচ্ছে। আমার প্রিয় একটা ফুলের গন্ধ। বেলিফুলের গন্ধ। গন্ধে কোনো অস্পষ্টতা নেই- নির্মল গন্ধ। এটা কি কোনো ম্যাজিক? আড়কের শিশি গোপনে ঢেলে দেয়া হয়েছে?

‘গন্ধ পাচ্ছেন না বাবা?’

‘জি পাচ্ছি।’

‘ভালো। এখন বলেন দেখি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছি?’

• • •

ময়লা-বাবা আবার চশমার ফাঁক দিয়ে তাকাচ্ছেন। ম্যাজিশিয়ান তাঁর কোনো খেলা দেখানোর পর যে-ভঙ্গিতে দর্শকের বিস্ময় উপভোগ করে— অবিকল সেই ভঙ্গি। আমি বললাম, আমার ধারণা আপনার কিছু ক্ষমতা আছে।

'কিছু ক্ষমতা তো সবারই আছে। আপনারও আছে।'

'আমি যদি ঢাকা শহরে আপনাকে নিয়ে যেতে চাই আপনি যাবেন?'

'না।'

'না কেন?'

'অসুবিধা আছে। আপনি বুঝবেন না।'

'তা হলে আজ উঠি।'

'আচ্ছা যান। আপনারে যে-খেলা দেখালাম তার জন্যে নজরানা দিবেন না? একশো টাকার নোটটা রেখে যান!'

'শুনছিলাম আপনি টাকাপয়সা নেন না।'

'সবার কাছ থেকে নেই না। আপনার কাছ থেকে নিব।'

'কেন?'

'সেটা বলব না। সবেরে সবকিছু বলতে নাই। আচ্ছা এখন যান। একদিনে অনেক কথা বলে ফেলেছি- আর না।'

'আমি যদি কাউকে সঙ্গে করে নিয়ে আসি, তাকে কি আপনি আপনার খেলা দেখাবেন?'

ময়লা-বাবা আবারও অপ্রকৃতিস্থের হাসি হাসতে শুরু করলেন। আমি একশো টাকার নোটটা তার পায়ের কাছে রেখে চলে এলাম। ময়লা-বাবার ব্যাপারটা নিয়ে মিসির আলি সাহেবের সঙ্গে আলাপ করতে হবে। সবচে ভালো হতো যদি তাকে সঙ্গে করে নিয়ে আসা যেত। সেটা বোধহয় সম্ভব হবে না। মিসির আলি-টাইপের মানুষ সহজে কৌতুহলী হন না। এঁরা নিজেদের চারপাশে শক্ত পাঁচিল তুলে রাখেন। পাঁচিলের

• • •

ভেতর কাউকে প্রবেশ করতে দেন না। এ-ধরনের মানুষদের কৌতুহলী করতে হলে পাঁচিল ভেঙে ভেতরে ঢুকতে হয়— সেই ক্ষমতা বোধহয় আমার নেই।

তবু একটা চেষ্টা তো চালাতে হবে। ময়লা-বাবার ক্ষমতাকে ফুলিয়ে-ফাঁপিয়ে বলে দেখা যেতে পারে। লাভ হবে বলে মনে হয় না। অনেক সময় নিয়ে মিসির আলি সাহেবের সঙ্গে কথা বলতে হবে। তিনি বিভ্রান্ত হবার মানুষ না, তবুও চেষ্টা করে দেখতে ক্ষতি কী?

@@

'কে?'

আমি জবাব দিচ্ছি না, চুপ করে আছি। দ্বিতীয়বার 'কে বললে জবাব দেব। মিসির আলি দ্বিতীয়বার কে বলবেন কি না বুঝতে পারছি না। আগের বার বলেননি- সরাসরি দরজা খুলেছেন। আজ আমি মিসির আলি সাহেবের জন্যে উপহার নিয়ে এসেছি। এক পট ব্রাজিলিয়ান কফি । ইভাপোরোটেড মিল্কের একটা কৌটা এবং এক বাক্স সুগার কিউবস্। কফি বানিয়ে চায়ের চামচে মেপে মেপে চিনি দিতে হবে না। সুগার কিউব ফেলে দিলেই হবে। একটা সুগার কিউব মানে এক চামচ চিনি। দুটা মানে দু-চামচ ।

উপহার আনার পেছনে ইতিহাসটা বলা যাক। শতাব্দী স্টোরে আমি গিয়েছিলাম টেলিফোন করতে। এমনিতে শতাব্দী লোকজনদের ব্যবহার খুব ভালো, শুধু টেলিফোন করতে গেলে খারাপ ব্যবহার করে। টেলিফোন নষ্ট, মালিকের নিষেধ আছে, চাবি নেই- নানান টালবাহানা করে। শেষ পর্যন্ত দেয় তবে টেলিফোন শেষ হওয়ামাত্র বলে, পাঁচটা

• • •

টাকা দেন। কল চার্জ। আজও তা-ই হলো। আমি হাতের মুঠা থেকে পাঁচশো টাকার একটা নোট বের করলাম ।

‘ভাংতি দেন!’

‘ভাংতি নেই। আর শুনুন, আপনাকে টাকা ফেরত দিতে হবে না। এখন যে-কলটা করেছি সেটা পাঁচশো টাকা দামের কল । আমার বান্ধবীর সঙ্গে কথা বলেছি, ওর নাম রূপা। আরেকটা কথা শুনুন ভাই- আমি যতবার আপনাদের এখান থেকে রূপার সঙ্গে কথা বলব ততবারই আপনাদের পাঁচশো করে টাকা দেব। তবে অন্য অন্য কলে আগের মতো পাঁচ টাকা। ভাই যাই?’

বলে আমি হনহন করে পথে চলে এসেছি— দোকানের এক কর্মচারী এসে আমকে ধরল। শতাব্দী স্টোরের মালিক ডেকেছেন। আমাকে যেতেই হবে, না গেলে তার চাকরি থাকবে না।

আমি মালিকের সঙ্গে দেখা করার জন্যে ফিরে গেলাম। নিতান্ত অল্পবয়েসি একটা ছেলে। গোলাপি রঙের হাওয়াই শার্ট পরে বসে আছে। সুন্দর চেহারা। ডিপার্টমেন্টাল স্টোরের মালিক হিসেবে তাকে মানাচ্ছে না। তাকে সবচে মানাত যদি টিভি সেটের সামনে বসে ক্রিকেট খেলা দেখত এবং কোনো ব্যাটসম্যান ছক্কা মারলে লাফিয়ে উঠত।

শতাব্দী স্টোরের মালিক আমাকে অতি যত্নে বসাল। কফি খাওয়াল। আমি কফি খেয়ে বললম, অসাধারণ! জীবনানন্দ দাশের কবিতার মতোই অসাধারণ।

সে বলল, কোন কবিতা?

আমি আবৃত্তি করলাম-

“পুরানো পেঁচারা সব কোটরের থেকে
এসেছে বাহির হয়ে অন্ধকার দেখে
মাঠের মুখের পরে,
সবুজ ধানের নিচে– মাটির ভিতরে
ইঁদুরেরা চলে গেছে- আঁটির ভিতর থেকে চ’লে গেছে চাষা,

• • •

শস্যের ক্ষেতের পাশে আজ রাতে আমাদের জেগেছে পিপাসা।”

শতাব্দী স্টোরের মালিক তাঁর এক কর্মচারীকে ডেকে বলল, ওনাকে সবচে ভালো কফি একটিন দাও, ইভাপোরেটেড দুধের একটা টিন, সুগার কিউব দাও।

আমি থ্যাংকস বলে উপহার গ্রহণ করলাম। তারপর ছেলেটা বলল, এখন থেকে দোকানে উনি এলে প্রথম জিজ্ঞেস করবে ওনার কী লাগবে । যা লাগবে দেবে। কোনো বিল করতে পারবে না। উনি ঢোকামাত্র আমার ঘরে নিয়ে যাবে। সেখানে টেলিফোন আছে । উনি যত ইচ্ছা টেলিফোন করতে পারবেন।

ব্যবসায়ী মানুষ (তার বয়স যত অল্পই হোক) এমন ফ্রী পাশ দেয় না। আমি বিস্মিত হয়ে তাকালাম । ছেলেটা বলল, আমি আপনাকে চিনি। আপনি হিমু। দোকানের লোকজন আপনাকে চিনতে পারেনি- ওদের অপরাধ ক্ষমা করবেন। এখন বলুন আপনি কোথায় যাবেন। ড্রাইভার আপনাকে নামিয়ে দিয়ে আসবে।

ড্রাইভার আমাকে মিসির আলির সাহেবের বাসার সামনে নামিয়ে দিয়ে গেছে। আমি কড়া নেড়ে অপেক্ষা করছি কখন মিসির আলি সাহেব দরজা খোলেন। দ্বিতীয়বার কড়া নাড়তে ইচ্ছা করছে না। সাধারণ মানুষের বাসা হলে কড়া নাড়তাম, এই বাসায় থাকেন মিসির আলি- কিংবদন্তি পুরুষ। প্রথম কড়া নাড়ার শব্দেই তার বুঝে যাবার কথা কে এসেছে, কেন এসেছে।

দরজা খুলল। মিসির আলি সাহেব বললেন, কে? হিমু সাহেব?

‘জি স্যার।’

‘মাথা কামিয়েছেন। আপনাকে ঋষি-ঋষি লাগছে।’

আমি ঋষিসুলভ হাসি হাসলাম। তিনি সহজ গলায় বললেন, আজ এত সকালসকাল এসেছেন, ব্যাপার কী? রাত মোটে নটা বাজে। হাতে কী?

‘আপনার জন্যে সামান্য উপহার। কফি, দুধ, চিনি।’

মিসির আলি সাহেবের চোখে হাসি ঝিলিক দিয়ে উঠল । আমি বলললাম, স্যার, আপনার রাতের খাওয়া কি হয়ে গেছে?

• • •

'হ্যাঁ, হয়েছে।'

'তা হলে আমাকে রান্নাঘরে যাবার অনুমতি দিন, আমি আপনার জন্যে কফি বানিয়ে নিয়ে আসি।'

'আসুন আমার সঙ্গে।'

আমি মিসির আলি সাহেবের সঙ্গে রান্নাঘরে ঢুকলাম। রান্নাঘরটা আমার পছন্দ হলো। মনে হচ্ছে রান্নাঘরটাই আসলে তার লাইব্রেরি। তিনটা উচু বেতের চেয়ার, শেলফভরতি বই। রান্না করতে করতে হাত বাড়ালেই বই পাওয়া যায়। রান্নাঘরে একটা ইজিচেয়ারও আছে। ইজিচেয়ারের পায়ের কাছে ফুটরেস্ট। বোঝাই যাচ্ছে ফুটরেস্টে পা রেখে আরাম করে বই পড়ার ব্যবস্থা ।

মিসির আলি চুলা ধরাতে ধরাতে বললেন, রান্নাঘরে এত বইপত্র দেখে আপনি কি অবাক হচ্ছেন?

'জি না। আমি কোনোকিছুতেই অবাক হই না।'

'আসলে কী হয় জানেন? হয়তো চা খাবার ইচ্ছা হলো। চুলায় কেতলি বসালাম। পানি ফুটতে অনেক সময় লাগছে। চুপচাপ অপেক্ষা করতে খুব খারাপ লাগে। তখন বই পড়া শুরু করি। চুলায় কেতলি বসিয়ে আমি একুশ পৃষ্ঠা পড়তে পড়তে পানি ফুটে যায়। এই থেকে আপনি আমার বই বড়ার স্পিড সম্পর্কে একটা ধারণা পাবেন।'

আমরা কফির পেয়ালা হাতে নিয়ে বসার ঘরে এসে বসলাম । মিসির আলি বললেন, আপনার গলায় কি মাছের কাঁটা ফুটেছে? লক্ষ্য করলাম অকারণে ঢোক গিলছেন।

আমি বললাম, জি।

'শুধুশুধু কষ্ট করছেন কেন? কাঁটা তোলার ব্যবস্থা করেন- মেডিক্যাল কলেজের ইমার্জেন্সিতে গেলেই ওরা চিমটা দিয়ে কাঁটা তুলে ফেলবে।'

'আমি কাঁটার যন্ত্রণা সহ্য করার চেষ্টা করছি। মানুষ তো ক্যানসারের মতো ব্যাধিও শরীরে নিয়ে বাস করে, আমি কাঁটা নিয়ে পারব না?'

• • •

মিসির আলি হাসলেন। ছেলেমানুষি যুক্তি শুনে বয়স্করা যে-ভঙ্গিতে হাসে সেই ভঙ্গির হাসি। দেখতে ভালো লাগে ।

'হিমু সাহেব!'

'জি স্যার?'

'আমি আপনার ভয় পাবার ব্যাপারটা নিয়ে ভেবেছি।'

'রহস্যের সমাধান হয়েছে?'

'ভয়ের কার্যকারণ সম্পর্কে একটা ব্যাখ্যা দাঁড় করিয়েছি। এইটিই সঠিক ব্যাখ্যা কি না তা প্রমাণসাপেক্ষ। ব্যাখ্যা শুনতে চান?'

'বলুন।'

মিসির আলি কফির কাপ নামিয়ে সিগারেট ধরালেন। সামান্য হাসলেন। সেই হাসি অতি দ্রুত মুছেও ফেললেন। কথা বলতে শুরু করলেন শান্ত গলায়। যেন তিনি নিজের সঙ্গেই কথা বলছেন, অন্য কারোর সঙ্গে নয়। যেন তিনি যুক্তি দিয়ে নিজেকেই বোঝানোর চেষ্টা করছেন

'হিমু সাহেব, আমার ধারণা যে- ভয়ের কথা আপনি বলছেন- এই ভয় অতি শৈশবেই আপনার ভেতর বাসা বেঁধেছে। কেউ-একজন হয়তো এই ভয়ের বীজ আপনার ভেতর পুঁতে রেখেছিল যাতে পরবর্তী কোনো একসময় বীজের অঙ্কুরোদগম হয়। তীব্র ভয় আপনাকে আচ্ছন্ন করে।

অতি শৈশবের তীব্র ভয় অনেক অনেককাল পরে ফিরে আসে। এটা একটা রিকারিং ফনোমেনা। মনে করুন তিন বছরের কোনো শিশু পানিতে ডুবে মৃত্যুর কাছাকাছি চলে গেল তাকে শেষমুহূর্তে পানি থেকে উদ্ধার করা হলো। সে বেঁচে গেল। পানিতে ডোবার ভয়ংকর স্মৃতি তার থাকবে না। সে স্বাভাবিকভাবে বড় হবে। কিন্তু ভয়ের এই অংশটি কিন্তু তার মাথা থেকে যাবে না। মস্তিস্কের স্মৃতি-লাইব্রেরিতে সেই স্মৃতি জমা থাকবে। কোনো কারণে যদি হঠাৎ সেই স্মৃতি বের হয়ে আসে তা হলে তার সমগ্র চেতনা প্রচণ্ড

নাড়া খাবে। সে ভেবেই পাবে না, ব্যাপারটা কী। আপনি কি শৈশবে কখনো পানিতে ডুবেছেন?'

'হ্যাঁ, চৌবাচ্চায় ডুবে গিয়েছিলাম।'

'ঘটনাটা বলুন তো।'

'ঘটনা আমার মনে নেই। বাবার ডায়েরি পড়ে জেনেছি। আমার বাবা আমাকে নিয়ে অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতেন। মৃত্যুভয় কী এটা আমাকে বোঝানোর জন্যে তিনি একটা ভয়ংকর পরীক্ষা করেছিলেন। চৌবাচ্চায় ভরতি করে আমাকে ডুবিয়ে দিয়েছিলেন। তার হাতে ছিল স্টপওয়াচ। তিনি স্টপওয়াচ দেখে পঁচাত্তর সেকেন্ড আমাকে পানিতে ডুবিয়ে রেখেছিলেন।'

'আপনার বাবা কি মানসিকভাবে অসুস্থ ছিলেন?'

'একসময় আমার মনে হতো তিনি মানসিক রোগী। এখন তা মনে হয় না। বাবার কথা থাক। আপনি আমার সম্পর্কে বলুন। আমি মানসিক রোগী কি না সেটা জানা আমার পক্ষে জরুরি।'

'অতি শৈশবের একটা তীব্র ভয় আপনার ভেতর বাসা বেঁধে ছিল। আমার ধারণা সেই ভয়ের সঙ্গে আরও ভয় যুক্ত হয়েছে। মস্তিস্কের মেমোরি সেলে ভয়ের ফাইল ভারি হয়েছে। একসময় আপনি সেই ভয় থেকে মুক্তি পেতে চেষ্টা করেছেন। তখনই ভয়টা মূর্তিমান হয়ে আপনার সামনে দাঁড়িয়েছে। সে চাচ্ছে না আপনি তাকে অস্বীকার করুন।'

'স্যার, আপনি কি বলতে চাচ্ছেন— ঐ রাতে আমি যা দেখেছি সবই আমার কল্পনা?'

'না । বেশির ভাগই সত্যি। তবে সেই সত্যটাকে কল্পনা ঢেকে রেখেছে।'

'বুঝতে পারছি না।'

'আমি বোঝানোর চেষ্টা করছি। ঐ রাতে আপনি ছিলেন খুব ক্লান্ত। আপনার স্নায়ু ছিল অবসন্ন।'

'খুব ক্লান্ত ছিলাম, স্নায়ু অবসন্ন ছিল বলছেন কেন?'

• • •

‘আপনার কাছ থেকে শুনেই বলছি। সারারাত আপনি হেঁটেছেন। জোছনা দেখেছেন। তারপর ঢুকলেন গলিতে। দীর্ঘ সময় কোনো-একটি বিশেষ জিনিস দেখায় ক্লান্তি আসে। স্নায়ু অবসন্ন হয়।’

‘ঠিক আছে বলুন।’

‘আপনাকে দেখে কুকুররা সব দাঁড়িয়ে গেল। একটি এগিয়ে এল সামনে, তা-ই না?’

‘জি।’

‘কুকুরদের দলপতি। আবার ঐ ভয়ংকর মূর্তি যখন এল তখন কুকুররা তার দিকে ফিরল। দলপতি এগিয়ে গেল সামনে। দেখুন হিমু সাহেব, কুকুররা যা করেছে তা হচ্ছে কুকুরদের জন্যে অত্যন্ত স্বাভাবিক কর্মকাণ্ড। তারা উদ্ভট কিছু করেনি। অথচ তাদের এই স্বাভাবিক কর্মকাণ্ডই আপনার কাছে খুব অস্বাভাবিক মনে হচ্ছিল। কারণ আপনি নিজে স্বাভাবিক ছিলেন না। আপনার মধ্যে একধরনের ঘোর কাজ করা শুরু করেছে। শৈশবের সমস্ত ভয় বাক্স ভেঙে বের হয়ে আসা শুরু করেছে।’

‘তারপর?’

‘আপনি শুনলেন লাঠি ঠকঠক করে কে যেন আসছে। আপনি যদি স্বাভাবিক থাকতেন তা হলে কিন্তু লাঠির ঠকঠক শব্দ শুনে ভয়ে অস্থির হতেন না। লাঠি ঠকঠক করে কেউ আসতেই পারে। আপনি খুবই অস্বাভাবিক অবস্থায় ছিলেন বলেই এই কাণ্ডটা ঘটেছে। আপনার মস্তিষ্ক অসম্ভব উত্তেজিত । সে বিচিত্র খেলা শুরু করেছে। আপনার স্বাভাবিক দৃষ্টি সে এলোমেলো করতে শুরু করেছে। আপনি মানুষটা দেখলেন। চাদরগায়ে একজন মানুষ যার চোখ নেই, মুখ নেই। ঠিক না?’

‘জি।’

‘আমার ধারণা আপনি অ্যাসিডে ঝলসে যাওয়া একজন অন্ধকে দেখেছেন। অন্ধ বলেই সে লাঠি-হাতে হাঁটাচলা করে। আপনাকে দেখে সে দাঁড়িয়ে পড়ল। লাঠি উঁচু করল আপনার দিকে। একজন অন্ধের পক্ষে আপনার উপস্থিতি বুঝতে পারা কোনো

ব্যাপার না। অন্ধদের ইন্দ্রিয় খুব তীক্ষ্ণ থাকে। অবিশ্যি অন্ধ না হয়ে একজন কুষ্ঠরোগীও হতে পারে। কুষ্ঠরোগীও এমন বিকৃত হতে পারে। আমি নিজে কয়েকজনকে দেখেছি।'

আমি বললাম, স্যার একটা কথা, আমি দেখেছি মানুষটা যখন ফিরে যাচ্ছিল তখন তাকে খুব লম্বা দেখাচ্ছিল।

'আপনি যা দেখেছেন তা আর কিছুই না, লাইট অ্যান্ড শেডের একটা ব্যাপার। গলিতে একটা মানুষকে দাঁড় করিয়ে আপনি বিভিন্ন জায়গা থেকে আলো গায়ে ফেলে পরীক্ষাটা করতে পারেন। দেখবেন আলো কোত্থেকে ফেলছেন, এবং সেই আলো ফেলার জন্যে তার ছায়া কতবড় হচ্ছে তার উপর নির্ভর করছে তাকে কত লম্বা মনে হচ্ছে। একে বলে 'optical illusion'- ম্যাজিশিয়ানরা optical illusion ের সাহায্যে অনেক মজার মজার খেলা দেখান।'

'পুরো ব্যাপারটা আপনার কাছে এত সহজ মনে হচ্ছে?'

'জি মনে হচ্ছে। পৃথিবীর সমস্ত জটিল সূত্রগুলির মূল কথা খুব সহজ। আপনি যে আপনার মাথার ভেতর শুনলেন কে বলছে ফিরে যাও, ফিরে যাও- তার ব্যাখ্যাও খুব সহজ ব্যাখ্যা । আপনার অবচেতন মন আপনাকে ফিরে যেতে বলছিল।'

'আমি কি আপনার সব ব্যাখ্যা গ্রহণ করে নেব, না নিজে পরীক্ষা করে দেখব?'

'সেটা আপনার ব্যাপার।'

'আমার কেন জানি মনে হয় ঐ জিনিসটার মুখোমুখি দাঁড়ানো মানে আমার মৃত্যু- সে আমাকে ছাড়বে না।'

'তা হলে তো আপনাকে অবশ্যই ঐ জিনিসটার মুখোমুখি হতে হবে।'

'যদি না হই?'

'তা হলে সে আপনাকে খুঁজে বেড়াবে। আজ একটা গলিতে সে আছে। কাল চলে আসবে রাজপথে। একটি গলি যেমন আপনার জন্যে নিষিদ্ধ হয়েছে, তেমনি শুরুতে একটা রাজপথও আপনার জন্যে নিষিদ্ধ হবে, তারপর আরও একটা । তারপর একসময়

• • •

দেখবেন শহরের সমস্ত পথঘাট নিষিদ্ধ হয়ে গেল। আপনাকে শেষ পর্যন্ত ঘরে আশ্রয় নিতে হবে। সেখানেও যে স্বস্তি পাবেন তা না- মাঝরাতে হঠাৎ মনে হবে দরজার বাইরে ঐ অশরীরী দাঁড়িয়ে, দরজা খুললেই সে ঢুকবে...'

আমি চুপ করে রইলাম।

মিসির আলি হাসিমুখে বললেন, আপনার বাবা বেঁচে থাকলে তিনি আপনাকে কী উপদেশ দিতেন?

আমি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললাম, আপনি যে উপদেশ দিচ্ছেন সেই উপদেশই দিতেন। আচ্ছা স্যার, আজ উঠি ।

'উঠবেন? আচ্ছা-কফির জন্যে ধন্যবাদ।'

'একটা কথা জিজ্ঞেস করি, মানুষের কি থটরিডিং আছে?'

'থাকতে পারে। পুরোপুরি নিশ্চিত করে বলা যাচ্ছে না। তবে নিম্নশ্রেণীর প্রাণীদের এই ক্ষমতা সম্ভবত আছে । ডিউক ইউনিভার্সিটিতে একবার একটা গবেষণা করা হয়েছিল। পঞ্চাশটা ইঁদুরকে দুটা থালায় করে খাবার দেয়া হতো। একটা থালায় নাম্বার 'এবং অন্যটার নাম্বার শূন্য। খাবার দেবার সময় মনে মনে ভাবা হতো শূন্য নাম্বার থালার খাবার যে-ইঁদুর খাবে তাকে মেরে ফেলা হবে। দেখা গেল শূন্য নাম্বার থালার খাবার কোনো ইঁদুর স্পর্শ করছে না। অথচ একই খাবার।'

'আপনার ধারণা ইঁদুর মানুষের মনের কথা বুঝত বলেই এটা করত?'

'হতে পারে।'

'আপনি থটরিডিং-এর ক্ষমতা আছে এমন কোনো মানুষের দেখা পাননি ?'

'পেয়েছি। তবে পুরোপুরি নিশ্চিত হতে পারিনি। নিশ্চিত হতে ইচ্ছাও করেনি। থাকুক-না কিছু রহস্য!'

'স্যার যাই।'

'আচ্ছা।'

মিসির আলি সাহেব আমাকে রাস্তা পর্যন্ত এগিয়ে দিলেন ।

• • •

আমি রাস্তায় নেমে দেখলাম সুন্দর জোছনা হয়েছে।

কোথায় যাওয়া যায়?

কোথাও যেতে ইচ্ছা করছে না। পথে-পথে হাঁটতেও ভালো লাগছে না। ভ্রমণের নেশায় মাতাল ভূপর্যটকও কি একসময় ক্লান্ত হয়ে বলেন হাঁটতে ভালো লাগছে না? পরম শ্রদ্ধেয় সাধু যিনি প্রতি সন্ধ্যায় মুণ্ডিত মস্তকে বৎসদের নানান জ্ঞানের কথা বলেন তিনিও কি একসময় ক্লান্ত হয়ে বলেন, আর ভালো লাগছে না? মানুষের শরীরযন্ত্রের দুটি তার একটিতে ক্রমাগতই বাজে- "ভালো লাগছে", "ভালো লাগছে"— অন্যটিতে বাজে "ভালো লাগছে না", "ভালো লাগছে না"। দুটি তার একসঙ্গেই বাজতে থাকে। একটি উঁচুস্বরে উঁচুসপ্তকে অন্যটি মন্ত্রসপ্তকে। কারও কারও কোনো একটি তার ছিঁড়ে যায়। আমার বেলায় কী হচ্ছে? ভালো লাগছে তারটি কি ছিঁড়ে গেছে?

ঘরে ফিরে যাব? চারদেয়ালে নিজেকে বন্দি করে ফেলব? সেই ইচ্ছাও করছে না। আমি আশরাফুজ্জামান সাহেবের সন্ধানে রওনা হলাম। তিনি কি কন্যার শ্বশুরবাড়িতে গিয়েছেন? মনে হয় না। অতি আদরের মানুষের অবহেলা সহ্য করার ক্ষমতা মানুষের নেই। মানুষ বড়ই অভিমানী প্রাণী ।

আশরাফুজ্জামান সাহেব বাসাতেই ছিলেন। আমাকে দেখে যন্ত্রের মতো গলায় বললেন, কেমন আছেন?

আমি বললাম, ভালো আছি। আপনি কী করছেন?

'কিছু করছি না। শুয়ে ছিলাম।'

'শরীর খারাপ?'

'জি না, শরীর খারাপ না। শরীর ভলো।'

'খাওয়াদাওয়া করেছেন?'

'জি না। রান্না করিনি।'

'আপনার কন্যার সঙ্গে যোগাযোগ হয়েছে?'

'জি না। ওরা চিটাগাং গেছে। ওর শ্বশুরবাড়ি চিটাগাং।'

• • •

‘যাবার আগে আপনার সঙ্গে দেখা করে যায়নি?’

‘আমাকে নেবার জন্যে লোক পাঠিয়েছিল, আমার যেতে ইচ্ছা করছিল না।’

‘আমি আপনাকে নিতে এসেছি।’

‘কোথায় নিয়ে যাবেন?’

‘তেমন কোথাও না। পথে-পথে হাঁটব। জোছনারাতে পথে হাঁটতে অন্যরকম লাগে, যাবেন?’

‘জি না।’

‘পথে হাঁটতে হাঁটতে আপনি আপনার মেয়ের গল্প করবেন, আমি শুনব। তার সব গল্প শোনা হয়নি। যাবেন?’

‘আচ্ছা চলুন।’

আমরা পথে নামলাম। ঠিক করে ফেললাম তাকে নিয়ে প্রচুর হাঁটব। হাঁটতে হাঁটতে তিনি ক্লান্ত হয়ে পড়বেন– শরীর যতই অবসাদগ্রস্ত হবে মন ততই হালকা হবে।

‘হিমু সাহেব!’

‘জি?’

‘আপনি বোধহয় ভাবছেন আমি মেয়ের উপর খুব রাগ করেছি। আসলে রাগ করিনি। কারণ রাগ করব কেন বলুন, আমি তো আসলেই তার বিয়ে ভেঙেছি। উড়োচিঠি দিয়েছি, টেলিফোনে খবর দিয়েছি।’

‘নিজের ইচ্ছায় তো করেননি। আপনার স্ত্রী আপনাকে করতে বলেছেন, আপনি করেছেন।’

‘খুবই সত্যি কথা, কিন্তু আমার মেয়ে বিশ্বাস করে না। তার মা'র সঙ্গে যে আমার কথাবার্তা হয় এটাও বিশ্বাস করে না।’

‘অল্প বয়সে সবকিছু অবিশ্বাস করার একটা প্রবণতা দেখা যায়। বয়স বাড়লে ঠিক হয়ে যাবে।’

• • •

'আমার মেয়ের কোনো দোষ নেই। আমার আত্মীয়স্বজনরা ক্রমাগত তার কানে মন্ত্রণা দেয়। আমি যে কী ধরনের মন্দলোক এটা শুনতে শুনতে সেও বিশ্বাস করে ফেলেছে।'

'আপনি মন্দলোক?'

'ওদের কাছে মন্দ লোক। মেয়ে অসুস্থ হলে ডাক্তারের কাছে নিই না। নিজে নিজে হোমিওপ্যাথি করি । এইসব আর কি...'

'ওরা তো জানে না, আপনি যা করেন স্ত্রীর পরামর্শে করেন।'

'জানে। ওদের বলেছি, কিন্তু ওরা বিশ্বাস করে না।'

'মেয়ের বিয়ে হয়ে যাবার পর কি আপনার স্ত্রীর সঙ্গে আপনার কথা হয়েছে?'

'জি না।'

'আশ্চর্য তো!'

'আমি নিজেও খুব আশ্চর্য হয়েছি। আজ সন্ধ্যা থেকে ঘর অন্ধকার করে শুয়েছিলাম। সে থাকলে অবশ্যই কথা বলত। সে নেই।'

'আশরাফুজ্জামান সাহেব, এমনও তো হতে পারে যে তিনি কোনোকালেই ছিলেন না। আপনার অবচেতন মন তাকে তৈরি করেছে। হতে পারে না?'

আশরাফুজ্জামান সাহেব জবাব দিলেন না। মাথা নিচু করে হাঁটতে লাগলেন।

'আশরাফুজ্জামান সাহেব!'

'জি?'

'খিদে লেগেছে?'

'জি।'

'আসুন খাওয়াদাওয়া করি।'

'আপনি খান। আমার কিছু খেতে ইচ্ছে করছে না। আমি এখন বাসায় চলে যাব। আপনার সঙ্গে ঘুরতে ভালো লাগছে না। আপনাকে আমি পছন্দ করতাম কারণ আমার ধারণা ছিল আপনি আমার স্ত্রীর কথা বিশ্বাস করেন।'

• • •

'আপনার স্ত্রীকে বিশ্বাস করি বা না-করি— আপনাকে তো করি । সেটাই কি যথেষ্ট না?'

'না।'

আশরাফুজ্জামান সাহেব হনহন করে এগুচ্ছেন। আমার খুব মায়া লাগছে। রাগ ভাঙিয়ে ভদ্রলোককে রাতের ট্রেনে তুলে দেয়া যায় না? তুর্ণা নিশিতায় তুলে দেব। সেই ট্রেন চিটাগাং পৌছায় ভোররাতে। আশরাফুজ্জামান সাহেব ট্রেন থেকে নেমে দেখবেন স্টেশনে তাকে নিতে মেয়ে এবং মেয়ে-জামাই দাঁড়িয়ে আছে। বাস্তবের সঙ্গে সব গল্পের সুন্দর সুন্দর সমাপ্তি থাকলে ভালো হয়। বাস্তবের গল্পগুলির সমাপ্তি ভালো না। বাস্তবের অভিমানী বাবারা নিজেদের অভিমান এত সহজে ভাঙে না। রূপকথার মতো সমাপ্তি বাস্তবে হয় না।

'আশরাফুজ্জামান সাহেব এক সেকেন্ড দাঁড়ান তো?'

আশরাফুজ্জামান সাহেব দাঁড়ালেন। আমি দৌড়ে তাকে ধরলাম।

'চলুন আপনাকে বাসা পর্যন্ত এগিয়ে দি।'

'দরকার নেই। আমি বাসা চিনে যেতে পারব।'

'আপনার জন্যে বলছি না। আমি আমার নিজের জন্যে বলছি। আমার একটা সমস্যা হয়েছে, আমি একা একা রাতে হাঁটতে পারি না। ভয় পাই।'

আশরাফুজ্জামান সাহেব শান্তগলায় বললেন, চলুন যাই।

আমরা হেঁটে হেঁটে ফিরছি, কেউ কোনো কথা বলছি না। আশরাফুজ্জামান সাহেবের গাল চকচক করছে। তিনি কাঁদছেন। কান্নাভেজা গালে চাঁদের ছায়া পড়েছে।

চোখের জলে চাঁদের ছায়া আমি এই প্রথম দেখছি। অদ্ভুত তো! ভেজা গালে চাদের আলো নিয়ে কি কোনো কবিতা হয়েছে? কোনো গান?

'আশরাফুজ্জামান সাহেব!'

'জি।'

'মেয়ের উপর রাগ কমেছে?'

• • •

‘ওর উপর আমার কখনো রাগ ছিল না। আচ্ছা হিমু সাহেব, আজ কি পূর্ণিমা?’

‘জি না। আজ পূর্ণিমা না। পূর্ণিমার জন্যে আপনাকে আরও তিনদিন অপেক্ষা করতে হবে।’

‘মেয়েটা কষ্ট পাবে। মেয়েটা ভাববে তার উপর রাগ করে বিষ খেয়েছি।’

‘তাকে সুন্দর করে গুছিয়ে একটা চিঠি লিখে যাবেন। ভালোমতো সব ব্যাখ্যা করবেন, তা হলেই হবে। তার পরেও কষ্ট পাবে। সেই কষ্ট দীর্ঘস্থায়ী হবে না।’

‘দীর্ঘস্থায়ী হবে না কেন?’

‘আপনার মেয়ে তার সংসার নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়বে। তার সংসারে ছেলেপুলে আসবে। কারও হাম হবে, কারোর হবে কাশি। ওদের বড় করা, স্কুলে ভরতি করানো, হোমওয়ার্ক করানো, ঈদে নুতন জামা কেনা, অনেক ঝামেলা। দোকানের পর দোকান দেখা হবে, ফ্রকের ডিজাইন পছন্দ হবে না। এত সমস্যার মধ্যে কে আর বাবার মৃত্যু নিয়ে মাথা ঘামাবে!’

আশরাফুজ্জামান সাহেব হেসে ফেললেন। সহজ স্বাভাবিক হাসি। মনে হচ্ছে তার মন থেকে কষ্টবোধ পুরোপুরি চলে গেছে।

‘হিমু সাহেব!’

‘জি?’

‘আপনি মানুষটা খুব মজার।’

‘মজার মানুষ হিসেবে আপনাকে মজার একটা সাজেশান দেব?’

‘দিন।’

‘চলুন আমরা কমলাপুর রেলস্টেশনে চলে যাই। আপনি তুর্ণা নিশিথায় চেপে বসুন। অন্ধকার থাকতে থাকতে চিটাগাং রেলস্টেশনে নামবেন। নেমেই দেখবেন আপনার মেয়ে এবং মেয়ে-জামাই দাঁড়িয়ে আছে। মেয়ের চোখভরতি জল। সে ছুটে এসে আপনাকে জড়িয়ে ধরবে।’

আশরাফুজ্জামান শব্দ করে হাসলেন। আমি বললাম, হাসছেন কেন?

• • •

'আপনার উদ্ভট কথাবার্তা শুনে হাসছি।'

'পৃথিবীটা ভয়ংকর উদ্ভট। কাজেই উদ্ভট কাণ্ডকারখানা- মাঝে মধ্যে করা যায়।'

'সবচে বড় কথা কী জানেন হিমু সাহেব? এখন বাজছে রাত বারোটা! তুর্ণা নিশিথা চলে গেছে।'

'আমার মনে হচ্ছে যায়নি। লেট করছে।'

'শুধু শুধু লেট করবে কেন?'

'লেট করবে- কারণ এই ট্রেনে চেপে এক অভিমানী পিতা আজ রাতে তাঁর কন্যার কাছে যাবেন। আমি নিশ্চিত আজ ট্রেন লেট।'

'আপনি নিশ্চিত?'

'হ্যাঁ, আমি নিশ্চিত। কারণ আমি হচ্ছি হিমু। পৃথিবীর রহস্যময়তা আমি জানি। ট্রেন যে আজ লেট হবে এই বিষয়ে আপনি বাজি ধরতে চান?'

'হ্যাঁ চাই। বলুন কী বাজি?'

'ট্রেন যদি সত্যি সত্যি লেট হয় তা হলে আপনি সেই ট্রেনে চেপে বসবেন।'

আশরাফুজ্জামান সাহেব চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছেন। মনে হয় ঠিক বুঝে উঠতে পারছেন না কী করবেন। আমি বেবিট্যাক্সির সন্ধানে বের হলাম। দেরি করা যাবে না- অতি দ্রুত কমলাপুর রেলষ্টেশনে পৌঁছতে হবে। আন্তনগর ট্রেন অনন্তকাল কারোর জন্যে দাঁড়িয়ে থাকে না।

ট্রেন লেট ছিল।

আমরা যাবার পনোরো মিনিট পর ট্রেন ছাড়ল চলন্ত ট্রেনের জানালা থেকে প্রায় পুরো শরীর বের করে আশরাফুজ্জামান সাহেব আমার দিকে হাত নাড়ছেন। তাঁর মুখভরতি হাসি, কিন্তু গাল আবারও ভিজে গেছে। ভেজা গালে স্টেশনের সরকারি ল্যাম্পের আলো পড়েছে। মনে হচ্ছে চাঁদের আলো।

• • •

@@

ঘুম ভাঙতেই প্রথম যে-কথাটা আমার মনে হলো তা হচ্ছে- 'আজ পূর্ণিমা'। ভোরের আলোয় পূর্ণিমার কথা মনে হয় না। সূর্য ডোবার পরই মনে হয়- রাতটা কেমন হবে? শুক্লপক্ষ, না কৃষ্ণপক্ষ? আমি অন্যান্যদের মতোই দিনের আলোয় চাঁদের পক্ষ নিয়ে ভাবি না, কিন্তু আজ অন্য ব্যাপার। আজ রাতের চাঁদের সঙ্গে আমার অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে। আজ মধ্যরাতে আমি সেই বিশেষ গলিটার সামনে দাঁড়াব। লাঠিহাতের ঐ মানুষটার মুখেমুখি হবো। মিসির আলির ধারণা- সে আর কিছুই না, সাধারণ রোগগ্রস্ত একজন মানুষ। কিংবা এক অন্ধ— চাঁদের আলোয় লাঠিহাতে যে বের হয়ে আসে। চাঁদের আলো তাকে স্পর্শ করে না ।

আমার ধারণা তা না। আমার ধারণা সে অন্যকিছু। তার জন্ম এই ভুবনে না, অন্য কোনো ভুবনে। সে-ভুবনের সঙ্গে আমাদের কোনো যোগাযোগ নেই। তার জন্ম আলোতে নয়— আদি অন্ধকারে।

জানালার কাছে একটা কাক এসে বসেছে। মাথা ঘুরিয়ে সে আমাকে দেখছে। তার চোখে রাজ্যের কৌতুহল। আমি দিনের শুরু করলাম কাকের সঙ্গে কথোপকথনের মধ্য দিয়ে।

'হ্যালো মিস্টার ক্রো, হাউ আর ইউ?'

কাক বলল— কা কা।

তার ধ্বনির অনুবাদ আমি মনে মনে করে নিলাম। সে বলছে, ভালো আছি। তুমি আজ এত ভোরে উঠেছ কেন? কাঁথাগায়ে শুয়ে থাকো। মানবসম্প্রদায়ে তোমার জন্ম । তুমি মহাসুখীজনদের একজন। খাবারের সন্ধানে সকাল থেকে তোমাকে উড়তে হয় না।

আমি বললাম, মানুষ হয়ে জন্মানোর অনেক দুঃখ আছে রে পাখি। অনেক দুঃখ ।

• • •

'দুঃখের চেয়ে সুখ বেশি।'

'জানি না। আমার মনে হয় না।'

'আমার মনে হয়- এই যে তুমি এখন উঠবে, এক কাপ গরম চা খাবে, একটা সিগারেট ধরাবে- এই আনন্দ আমরা কোথায় পাব! আমাদের তো মাঝে মাঝে চা খেতে ইচ্ছে করে!'

'তাই বুঝি?'

'হ্যাঁ তা-ই।'

আমি বিছানা থেকে নামলাম। দুকাপ চায়ের কথা বলে বাথরুমে ঢুকলাম। হাতমুখ ধুয়ে নতুন একটা দিনের জন্যে নিজেকে প্রস্তুত করা। আজকের দিনটা আমার জন্যে একটা বিশেষ দিন। সূর্য ডোবার আগ পর্যন্ত আমি পরিচিত সবার সঙ্গে কথা বলব। দিনটা খুব আনন্দে কাটাব। সন্ধ্যার পর দিঘির পানিতে গোসল করে নিজেকে পবিত্র করব— তারপর চাঁদের আলোয় তার সঙ্গে আমার দেখা হবে । হাতে-মুখে পানি দিতে দিতে দ্রুত চিন্তা করলাম— কাদের সঙ্গে আমি কথা বলব-

রূপা

আজ তার সঙ্গে কথা বলব প্রেমিকের মতো। তাকে নিয়ে চন্দ্রিমা উদ্যানে কিছুক্ষণ হাঁটাহাটিও করা যেতে পারে। একগাদা ফুল কিনে তার বাড়িতে উপস্থিত হবো। রক্তের মতো লাল রঙের গোলাপ।

ফুপা-ফুপু

তাঁরা কি কক্সবাজার থেকে ফিরেছেন? না ফিরে থাকলে টেলিফোনে কথা বলতে হবে। কক্সবাজারে কোন হোটেলে উঠেছেন তাও তো জানি না। বড় বড় হোটেল সবকটায় টেলিফোন করে দেখা যেতে পারে।

• • •

মিসির আলি

কিছুক্ষণ গল্পগুজব করব। দুপুরের খাওয়াটা তার সঙ্গে খেতে পারি। তাকে আজ রাতের অ্যাপয়েন্টমেন্টের কথাটা বলা যেতে পারে...

আচ্ছা, দিঘি কোথায় পাব? ঢাকা শহরে সুন্দর দিঘি আছে না? কাকের চোখের মতো টলটলে পানি?

'স্যার চা আনছি।'

আমি চায়ের কাপ নিয়ে বসলাম। এক কাপ চা জানালার পাশে রেখে দিলাম— মি. ক্রো যদি খেতে চান খাবেন।

আশ্চর্য, কাকটা ঠোঁট ডোবাচ্ছে গরম চায়ে । কক কক করে কী যেন বলল। ধন্যবাদ দিল বলে মনে হচ্ছে। পশুপাখির ভাষাটা জানা থাকলে খুব ভালো হতো। মজার মজার তথ্য অনেক কিছু জানা যেত। পশুপাখির ভাষা জানাটা খুব কি অসম্ভব? আমাদের এক নবী ছিলেন না যিনি পশুপাখির কথা বুঝতেন? হযরত সুলাইমান আলায়হেস-সালাম । তিনি পাখিদের সঙ্গে কথা বলতেন। কোরআন শরিফে আছে- পিঁপড়েরা তার সঙ্গে কথা বলেছে। একটা পাখিও তার সঙ্গে কথা বলেছিল, পাখির নাম হুদ হুদ। সূরা সাদে তার সুন্দর বর্ণনা আছে।

হুদ হুদ পাখি এসে বলল, "আমি এমনসব তথ্য লাভ করেছি, যা আপনার জানা নেই। আর আমি 'সেবা' থেকে আসল খবর নিয়ে এসেছি । আমি এক নারীকে দেখলাম যে জাতির উপর রাজত্ব করছে। তার সবই আছে, এবং আছে এক বিরাট সিংহাসন।"

হুদ হুদ পাখি বলেছিল সেবার রানির কথা। কুইন অব সেবা- 'বিলকিস'।

হুদ হুদ পাখিটা দেখতে কেমন? কাক নয় তো?

• • •

কাকটা চায়ের কাপ উলটে ফেলেছে। তার ভাবভঙ্গিতে অপ্রস্তুত ভাব লক্ষ্য করছি। কেমন আড়চোখে আমার দিকে তাকাচ্ছে- যেন বলার চেষ্টা করছে, Sir I am sorry, extremely sorry. I have broken the cup.

না, Broken the cup হবে না, কাপ ভাঙেনি, শুধু উলটে ফেলেছে। চায়ের কাপ উলটে ফেলার ইংরেজি কী হবে? রূপাকে জিজ্ঞেস করে জেনে নিতে হবে । শতাব্দী স্টোর থেকে কিছু টেলিফোন করে দিনের শুরুটা করা যাক।

শতাব্দী স্টোরের লোকজন আমাকে দেখে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। তিনজন এসে জিজ্ঞেস করল, স্যার কেমন আছেন? একজন এসে অতি যত্নে মালিকের ঘরে নিয়ে বসাল। টেলিফোনের চাবি খুলে দিল। আমি বসতে বসতেই কফি চলে এল, সিগারেট চলে এল। পীর-ফকিররা যে কত আরামে জীবনযাপন করেন তা বুঝতে পারছি। শতাব্দী স্টোরে মালিক উপস্থিত নেই, কিন্তু আমার কোনো সমস্যা হচ্ছে না।

'হ্যালো, এটা কি রূপাদের বাড়ি?'

'কে কথা বলছেন?'

'আমার নাম হিমু।'

'রূপা বাড়িতে নেই। বান্ধবীর বাসায় গেছে।'

'এত সকালে বান্ধবীর বাড়িতে যাবে কীভাবে! এখনও নাটা বাজেনি। রূপা তো আটটার আগে ঘুম থেকেই ওঠে না।'

'বলেছি তো ও বাসায় নেই।'

'আপনি তো মিথ্যা বলছেন। আপনার গলা শুনেই বুঝতে পারছি আপনি একজন দায়িত্বশীল বয়স্ক মানুষ-আপনি দিনের শুরু করেছেন মিথ্যা দিয়ে। এটা কি ঠিক হচ্ছে? আপনি চাচ্ছেন না, রূপা আমার সঙ্গে কথা বলুক। সেটা বললেই হয়- শুধুশুধু মিথ্য বলার প্রয়োজন ছিল না।'

'স্টপ ইট।'

'ঠিক আছে স্যার, স্টপ করছি। রূপাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করতে চাচ্ছিলাম- আমার মনে হয় আপনাকে জিজ্ঞেস করলেও হবে। আচ্ছা স্যার, চায়ের কাপ উলটে ফেলার ইংরেজি কী?'

খট করে শব্দ হলো । ভদ্রলোক টেলিফোন নামিয়ে রাখলেন। তিনি এখন যা করবেন তা হচ্ছে টেলিফোনের প্লাগ খুলে রাখবেন, এবং হয়তো-বা মেয়েকে কোথাও পাঠিয়ে দেবেন। ভদ্রলোককে প্রচুর মিথ্যা কথা আজ সারাদিনে বলতে হবে। মিথ্যা দিয়ে যিনি দিনের শুরু করেন, তাকে দিনের শেষেও মিথ্যা বলতে হয়।

আমি ফুপুর বাসায় টেলিফোন করলাম। ফুপুকে পাওয়া গেল। তিনি রাগে চিড়বিড় করে জ্বলছেন।

'কে, হিমু। আমার তো সর্বনাশ হয়ে গেছে, শুনেছিস কিছু?'

'না, কী হয়েছে?'

'রশিদ হারামজাদাটাকে বাসায় রেখে গিয়েছিলাম, সে টিভি, ভিসিআর সব নিয়ে হাওয়া হয়ে গেছে। আমার আলমিরাও খুলেছে। সেখান থেকে কী নিয়েছে এখনও বুঝতে পারছি না।'

'মনে হয় গয়না-টয়না নিয়েছে।'

'না, গয়না নিতে পারবে না। সব গয়না ব্যাংকের লকারে । ক্যাশ টাকা নিয়েছে। তোর ফুপার একটা বোতলও নিয়েছে। খুব দামি জিনিস নাকি ছিল। তোর ফুপা হায়হায় করছে।'

'এই দেখুন ফুপু, সব খারাপ দিকের একটা ভালো দিকও আছে। রশিদ আপনার চক্ষুশূল একটা জিনিসও নিয়ে গেছে।'

'ফাজলামি করিস না- পয়সা দিয়ে একটা জিনিস কেনা।'

'ফ্রিজে আপনাদের জন্যে চিতলমাছের পেটি রান্না করা ছিল না?'

'হ্যাঁ, ছিল। তুই জানলি কী করে?'

'সে এক বিরাট ইতিহাস। পরে বলব, এখন বলুন কক্সবাজারে কেমন কাটল।'

• • •

‘ভালোই কাটছিল, মাঝখানে সাদেক গিয়ে উপস্থিত হলো।’

‘মামলা-বিষয়ক সাদেক?’

‘হ্যাঁ। দ্যাখ-না যন্ত্রণা! তাকে ঠাট্টা করে কী না কী বলেছি- সে সত্যি সত্যি মামলাটামলা করে বিশ্রী অবস্থা করেছে। বেয়াই-বেয়ানের কাছে লজ্জায় মুখ দেখাতে পারি না। ছি ছি!’

‘আপনার বেয়াই-বেয়ান কেমন হয়েছে?’

‘বেয়াইসাহেব তো খুবই ভালো মানুষ। অসম্ভব রসিক। কথায়-কথায় হাসছিলেন। তোর ফুপার সঙ্গে তার খুবই খাতির হয়েছে। চারজনে মিলে নরক-গুলজার করেছে।’

‘চারজন পেলেন কোথা? ফুপা আর তার বেয়াই দুজন হবে না?’

‘এদের সাথে দুই ছাগলাও তো আছে- মোফাজ্জল আর জহিরুল।’

‘এই দুইজন এখনও ঝুলে আছে?’

‘আছে তো বটেই! তবে দুটাকে যত খারাপ ভেবেছিলাম তত খারাপ না।’

‘ভালো কাজ কী করেছে?’

‘সাদেককে শিক্ষা দিয়েছে। আমি তাতে খুব খুশি হয়েছি। সাদেক সবার সামনে মামলা নিয়ে হৈচৈ শুরু করল, ওয়ারেন্ট নাকি বের হয়ে গেছে এইসব। আমি লজ্জায় বাঁচি না। কী বলব কিছু বুঝতেও পারছি না, তখন মোফাজ্জল এসে ঠাশ করে সাদেকের গালে এক চড় বসিয়ে দিল।’

‘সেকী!’

‘খুবই আকস্মিক ঘটনা, আমি খুব খুশি হয়েছি। উচিত শিক্ষা হয়েছে। ছোটলোকের বাচ্চা— আমাকে মামলা শেখায়!’

‘মোফাজ্জল আর জহিরুল মনে হচ্ছে আপনাদের পরিবারে এন্ট্রি পেয়ে গেছে?’

‘এন্ট্রি পাওয়ার কী আছে! সঙ্গে সঙ্গে ঘোরে, মায়া পড়ে গেছে এটা বলতে পারিস।’

‘আমাদের সর্বনাশ করল এই মায়া! আমরা বাস করি মায়ার ভেতর আর চেঁচিয়ে বলি আমাদেরকে মায়া থেকে মুক্ত করো!’

• • •

'জ্ঞানের কথা বলবি না হিমু চড় খাবি।'

'জ্ঞানের কথা না ফুপু। আমার সহজ কথা হচ্ছে মায়া সর্বগ্রাসী । এই যে রশিদ আপনার এত বড় ক্ষতি করল তার পরেও সে যখন মিডল ইষ্ট থেকে ফিরবে, জায়নামাজ, তসবি এবং মিষ্টি তেঁতুল নিয়ে আপনার সঙ্গে দেখা করতে যাবে, আপনি কিন্তু খুশিই হবেন। আপনি হাসিমুখে বলবেন- কেমন আছিস রে রশীদ?'

'ঐ হারামজাদা কি মিডল ইষ্ট যাচ্ছে?'

'হ্যাঁ।'

'তুই এতসব জানলি ক করে?'

'কী আশ্চর্য, আমি জানব না। আমি হচ্ছি হিমু!'

'তুই ফাজিল বেশি হয়েছিস । তোকে ধরে চাবকানো উচিত, হাসছিস কেন?'

'বাদল এবং আঁখি এরা কেমন আছে?'

'ভালোই আছে। কক্সবাজারে ওরা যে-কাণ্ডটা করেছে- আমার তো লজ্জায় মাথা কাটা যাবার অবস্থা।'

'কী করেছে?'

আরে, দিনরাত চব্বিশ ঘণ্টা হোটেলের দরজা বন্ধ করে বসা। আমরা এতগুলি মানুষ এসেছি সেদিকে কোনো লক্ষই নেই। ডাইনিংহলে সবাই খেতে বসি, ও খবর পাঠায়- জ্বরজ্বর লাগছে। আসতে পারবে না। খাবার যেন পাঠিয়ে দেয়া হয়। আমার পেটের ছেলে যে এত নির্লজ্জ হবে ভাবতেই পারি না।'

'ফুপু!'

'বল কী বলবি।'

'সত্যি করে বলুন তো ওদের ভালোবাসা দেখে আনন্দে আপনার মন ভরে গেছে না? কী, কথা বলছেন না কেন? আপনাদের যখন বিয়ে হয়েছিল— আপনি এবং ফুপা- আপনারা কি এই কান্ড করেননি?'

'আমরা এত বেহায়া ছিলাম না।'

• • •

‘আমার তো ধারণা আপনারাও ছিলেন।’

‘তোর ফুপা অনেক বেহায়াপনা করেছে। বুদ্ধিকম মানুষ তো! বাদ দে।’

‘না, বাদ দেব না। আপনারা কী ধরনের বেহায়াপনা করেছেন তার একটা উদাহরণ দিতেই হবে। জাস্ট ওয়ান।’

‘হিমু!’

‘জি ফুপু?’

‘তুই এত ভালো ছেলে হয়েছিস কেন বল তো?’

‘আমি কি ভালো ছেলে?’

‘অবশ্যই ভাল ছেলে। তুই আমার একটা কথা শোন- ভালো দেখে একটা মেয়েকে বিয়ে কর । তারপর তুই বউমাকে নিয়ে নানান ধরনের বেহায়াপনা করবি- আমরা সবাই দূর থেকে দেখে হাসব।’

‘ফুপু রাখি?’ বলে আমি খট করে রিসিভার রেখে দিলাম। কারণ কথা বলতে বলতে ফুপু কেঁদে ফেলেছেন, এটা আমি বুঝতে পারছি- মাতৃশ্রেণীর মানুষের কান্নাভেজা গলার আহবান অগ্রাহ্য করার ক্ষমতা মানুষকে দেয়া হয়নি। সেই আহবান এই কারণেই শোনা ঠিক না।

মিসির আলি বললেন, আপনার কি শরীর খারাপ?

আমি বললাম, জি না।

‘দেখে মনে হচ্ছে খুব শরীর খারাপ। আপনি কি কোনো কারণে টেনশান বোধ করছেন?’

‘স্যার, আজ পূর্ণিমা।’

ও আচ্ছা আচ্ছা, বুঝতে পারছি। আপনি তা হলে ভয়ের মুখোমুখি হতে যাচ্ছেন?’

‘জি স্যার।’

‘আপনি যদি চান- আমি আপনার সঙ্গে থাকতে পারি।’

• • •

'না, আমি চাচ্ছি না।'

'দুপুরে খাওয়াদাওয়া করেছেন?'

'জি না।'

আমার সঙ্গে চারটা খান। খাবার অবিশ্যি খুবই সামান্য। খিচুড়ি আর ডিমভাজা। খাবেন?'

'জি খাব।'

'হাতমুখ ধুয়ে আসুন। আমি খাবার সাজাই।'

'দুজনের মতো খাবার কি আছে?'

'হ্যাঁ আছে। খুবই আশ্চর্যের ব্যাপার হচ্ছে আজ সকালে ঘুম ভেঙেই মনে হলো- দুপুরে ক্ষুধার্ত অবস্থায় আপনি আমার এখানে আসবেন। এইসব টেলিপ্যাথিক ব্যাপারের কোনো গুরুত্ব আমি দিই না-তার পরেও দুজনের খাবার রান্না করেছি। কেন বলুন তো?'

'বলতে পারছি না।'

'আমাদের মনের একটা অংশ রহস্যময়তায় আচ্ছন্ন। আমরা অনেক কিছুই জানি তাঁর পরেও অনেককিছু জানি না। বিজ্ঞান বলেছে- 'Out of nothing nothing can be created'- তার পরেও আমরা জানি শূন্য থেকেই এই অনন্ত নক্ষত্রবীথি তৈরি হয়েছে যা একদিন হয়তো-বা শূন্যেই মিলিয়ে যাবে। ভাবলে ভয়াবহ লাগে বলে ভাবি না।'

'স্যার, আপনার খিচুড়ি খুব ভালো হয়েছে।'

'ধন্যবাদ। হিমু সাহেব!'

'জি স্যার?'

'আপনি যদি মনে করেন ঐ জিনিসটার মুখোমুখি হওয়া ঠিক হবে না তা হলে বাদ দিন।'

'এই কথা কেন বলছেন?'

• • •

'বুঝতে পারছি না কেন বলছি। আমার লজিক বলছে- আপনার উচিত ভয়ের মুখোমুখি হওয়া, আবার এই মুহূর্তে কেন জানি মন সায় দিচ্ছেনা। মনে হচ্ছে মস্ত কোনো বিপদ আপনার সামনে।'

আমি হাসিমুখে বললাম, এরকম মনে হচ্ছে কারণ আপনি আমার প্রতি একধরনের মায়া অনুভব করছেন। যখন কেউ কারও প্রতি মমতাবোধ করতে থাকে তখনই সে লজিক থেকে সরে আসতে থাকে। মায়া, মমতা, ভালোবাসা যুক্তির বাইরের ব্যাপার।

'ভালো বলেছেন।'

'এটা আমার কথা না। আমার বাবার কথা। বাবার বাণী । তিনি তার বিখ্যাত বাণীগুচ্ছে তার পুত্রের জন্যে লিখে রেখে গেছেন।'

'আমি কি সেগুলি পড়ে দেখতে পারি?'

'হ্যাঁ পারেন। আমি বাবার খাতাটা নিয়ে এসেছি আপনাকে দিয়ে যাব। তবে একটা শর্ত আছে।'

'কী শর্ত?'

'আমি যদি কোনোদিন ফিরে না আসি আপনি খাতার লেখাগুলি পড়বেন। আর যদি কাল ভোরে ফিরে আসি, আপনি খাতা না-পড়েই আমাকে ফেরত দেবেন।'

'খুব জটিল শর্ত তো না।'

'না। শর্ত আপনার জন্যে জটিল না। আমার জন্যে জটিল।'

মিসির আলি হাসলেন নরম গলায় বললেন, ঠিক আছে।

আমি খাওয়া শেষ করে, খাতা তার হাতে দিয়ে বের হলাম। ঘুম পাচ্ছে। পার্কের বেঞ্চিতে শুয়ে লম্বা ঘুম দেব যখন জেগে উঠব তখন যেন দেখি চাঁদ উঠে গেছে।

• • •

@@

ঘুমভেঙে একটু হকচকিয়ে গেলাম। আমি কোথায় শুয়ে আছি? সবকিছু খুব অচেনা লাগছে। মনে হচ্ছে গহিন কোনো অরণ্যে শুয়ে আছি। চারদিকে সুনসান নীরবতা। খুব হাওয়া হচ্ছে- হাওয়ায় গাছের পাতা কাঁপছে। অসংখ্য পাতা একসঙ্গে কেঁপে উঠলে যে অস্বাভাবিক শব্দতরঙ্গ সৃষ্টি হয় সেরকম শব্দ। ব্যাপারটা কী? আমি ধড়মড় করে উঠে বললাম। তাকালাম চারদিকে। না, যা ভাবছিলাম তা না।

আমি সোহরাওয়াদি উদ্যানের একটা পরিচিত বেঞ্চিতেই শুয়েছিলাম । গাছের পাতার শব্দ বলে যা ভাবছিলাম তা আসলে গাড়ি চলাচলের শব্দ। এতবড় ভ্রান্তিও মানুষের হয়?

আকাশে চাঁদ থাকার কথা না? কই, চাঁদ দেখা যাচ্ছে তো! পার্ক অন্ধকার। পার্কের বাতি কখন জ্বলবে? ঢাকা মিউনিসিপ্যালিটি পুর্ণিমার রাতে শহরের সব বাতি জ্বালায় না। চাঁদই তো আছে- সব বাতি জ্বালানোর দরকার কী? এরকম ভাব।

পূর্ণিমার প্রথম চাঁদ হলুদ বর্ণের থাকে। আকারেও সেই হলুদ চাঁদটাকে খুব বড় লাগে । যতই সময় যায় হলুদ রঙ ততই কমতে থাকে। একসময় চাঁদটা ধবধবে সাদা হয়ে আবারও হলুদ হতে থাকে। দ্বিতীয়বার হলুদ হবার প্রক্রিয়া শুরু হয় মধ্যরাতের পর । আজ আমার যাত্রা মধ্যরাতে । আমি আবারও চাঁদ দেখার চেষ্টা করলাম ।

‘কী দেহেন?’

আমি চমকে প্রশ্নকর্তার দিকে তাকালাম। ঝুপড়ির মতো জায়গায় মেয়েটা বসে আছে। নিশিকন্যাদের একজন। যে-গাছের গুড়িতে সে হেলান দিয়ে আছে সেটা একটা কদমগাছ। আমার প্রিয় গাছের একটি। রুবিয়েসি পরিবারের গাছ। বৈজ্ঞানিক নাম এনথোসেফালাস কাদাম্বা। গাছটা দেখলেই গানের লাইন মনে পড়ে—“বাদল দিনের প্রথম কদম ফুল করেছ দান।”

• • •

আমি মেয়েটির দিকে তাকিয়ে বললাম, কী নাম?

সে ‘থু’ করে থুথু ফেলে বলল, কদম ।

আসলেই কি তার নাম কদম? না সে রসিকতা করছে, কদমগাছের নিচে বসেছে বলে নিজের নাম বলছে কদম? বিচিত্র কারণে এ-ধরনের মেয়েরা রসিকতা করতে পছন্দ করে। পৃথিবী তাদের সঙ্গে রসিকতা করে বলেই বোধহয় খানিকটা রসিকতা তারা পৃথিবীর মানুষদের ফেরত দেয়।

‘তোমার নাম কদম?’

‘হু।’

‘যখন নারিকেল গাছের গুড়িতে হেলান দিয়ে বস তখন তোমার নাম কী হয়? নারকেল?’

মেয়েটি খিলখিল করে হেসে উঠল। এখন আর তাকে নিশিকন্যাদের একজন বলে মনে হচ্ছে না। পনেরো-ষোলো বছরের কিশোরীর মতো লাগছে, সে সন্ধ্যাবেলা একা একা বনে বেড়াতে এসেছে। হাসি খুব অদ্ভুত জিনিস। হাসি মানুষের সব গ্লানি উড়িয়ে নিয়ে যায়।

‘আমার নাম ছফুরা।’

‘ছফুরার চেয়ে তো কদম ভালো।’

‘আচ্ছা যান, আফনের জন্যে কদম।’

‘একেক জনের জন্যে একেক নাম? ভালো তো!’

‘আফনের ভালো লাগলেই আমার ভালো।’

মেয়েটা গাছের নিচ থেকে উঠে এসে আমার পাশে বেঞ্চিতে বসে হাই তুলল। মেয়েটার মুখ পরিস্কার দেখা যাচ্ছে না, তার পরেও মনে হচ্চে দেখতে মায়াকাড়া। কৈশোরের মায়া মেয়েটি এখনও ধরে আছে। বেশিদিন ধরে রাখতে পারবে না। কদম শাড়ি পরে আছে। শাড়ির আঁচলে বাদাম। সে বাদাম ভেঙে ভেঙে মুখে দিচ্ছে।

‘এট্টু পরে পরে আসমানের দিকে চাইয়া কী দেহেন?’

• • •

'চাঁদ উঠেছে কি না দেখি।'

'চাঁদের খোঁজ নিতাছেন ক্যান? আফনে কি চাঁদ সওদাগর?'

কদম আবারও খিলখিল করে হাসল। আমি মেয়েটির কথার পিঠ কথা বলার ক্ষমতা দেখে মুগ্ধ হলাম।

'রাগ হইছেন?'

'রাগ হবো কেন?'

'এই যে আফনেরে নিয়া তামশা করতেছি।'

'না, রাগ হইনি।'

'আমর ভিজিট পঞ্চাশ টেকা।'

'পঞ্চাশ টাকা ভিজিট?'

'হু।'

'ভিজিট দেবার সামর্থ্য আমার নেই। এই দ্যাখো পাঞ্জাবির পকেট পর্যন্ত নেই।'

'পঞ্চাশ টেকা আফনের কাছে বেশি লাগতেছে?'

'না। পঞ্চাশ টাকা বরং কম মনে হচ্ছে- রমণীর মন সহস্র বৎসরের সখা সাধনার ধন।'

'আফনের কাছে আসলেই টেকা নাই?'

'না।'

'সত্য বলতেছেন?'

'হ্যাঁ। আর থাকলেও লাভ হতো না।'

'ক্যান, মেয়েমানুষ আফনের পছন্দ হয় না?'

'হয়। হবে না কেন?'

আমার চেহারাছবি কিন্তু ভালো। আন্ধাইর বইল্যা বুঝতেছেন না। যখন চাঁদ উঠবো তহন দেখবেন।'

'তা হলে বসো— অপেক্ষা করো। চাঁদ উঠুক।'

• • •

'আপনের কাছে ভিজিটের টেকা নাই। বইস্যা থাইক্যা ফায়দা কী?'

'কোনো ফয়দা নেই।'

'আফনে এইখানে কতক্ষণ থাকবেন?'

'বুঝতে পারছি না, ভালমতো চাঁদ না ওঠা পর্যন্ত থাকব।'

'তাইলে আমি এটু ঘুরান দিয়া আসি?'

'আসার দরকার কী?'

'আচ্ছা যান আসব না। আমার ঠেকা নাই।'

'ঠেকা না থাকাই ভালো।'

'বাদাম খাইবেন?'

'না।'

'ধরেন খান। ভালো বাদাম । নাকি খারাপ মেয়ের হাতের জিনিস খান না?'

কদম আঁচলের বাদাম বেঞ্চিতে ঢেলে দ্রুতপায়ে চলে গেল। আমি বসে বসে বাদাম খাচ্ছি। একটা হিসাবনিকাশ করতে পারলে ভালো হতো— আমি আমার একজীবনে কত মানুষের অকারণে মমতা পেয়েছি, এবং কতজনকে সেই মমতা ফেরত দিতে পেরেছি। মমতা ফেরত দেবার অংশগুলি মনে থাকে- মমতা পাবার অংশগুলি মনে থাকে না । কিছুদিন পর মনেই থাকবে না কদম-নামের একটি পথের মেয়ে নিজের অতি কষ্টের টাকায় কেনা বাদাম আমাকে খেতে দিয়েছিল। কিন্তু আমি যখন পথে নামব, ফুটপাতে শুয়ে-থাকা মানুষের দিকে তাকাব, সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়বে- বস্তা-ভাই এবং বস্তা-ভাইয়ের পুত্রকে আমি একবার একটা স্লিপিং ব্যাগ উপহার দিয়েছিলাম।

আকাশে চাঁদ উঠেছে। হলুদ রঙের কুৎসিত একটা চাঁদ। চাঁদটাকে সাজবার সময় দিতে হবে। তার সাজ সম্পন্ন হোক, তারপর আমি বের হবো। এইমাত্র ঘুম থেকে উঠেছি, তার পরেও চোখ থেকে ঘুম যাচ্ছে না। বেঞ্চিতে আবার শুয়ে থাকা যাক। আমি শুয়ে পড়লাম। মশা খুব উৎপাত করছে, তবে কামড়াচ্ছে না। বনের মশারা কামড়ায় না। পার্কের সব বাতি জ্বলে উঠেছে। গাছপালার সঙ্গে ইলেট্রিকের আলো একেবারেই

• • •

মানায় না। ইলেকট্রিকের আলোয় মনে হচ্ছে গাছগুলির অসুখ করেছে। খারাপ ধরনের কোনো অসুখ।

আমি অপেক্ষা করছি।

কিসের অপেক্ষা? আশ্চর্যের ব্যাপার, আমি অপেক্ষা করছি কদম-নামের মেয়েটার জন্যে। সে আসবে, তার সঙ্গে কিছুক্ষণ গল্পগুজব করব। আলোর অভাবে তার মুখ ভালো করে দেখা হয়নি। এইবার দেখা হবে । সে কোথায় থাকে সেই জায়গাটাও তো দেখে আসা যায়। মেয়েটার নিজের কি কোনো সংসার আছে? পাইপের ভেতরের একার এক সংসার। যে-সংসার সে খুব গুছিয়ে সাজিয়েছে। পুরানো কালেন্ডারের ছবি দিয়ে চারদিক সাজানো । ছোট্ট ধবধবে সাদা একটা বালিশ। বালিশে ফুল-তোলা। অবসরে সে নিজেই সুই সুতা দিয়ে ফুল তুলে নিজের নাম সই করেছে- কদম।

না, কদম না। মেয়েটার নাম হলো ছফুরা। নামটা কি আমার মনে থাকবে? আজ মধ্যরাতের পর আবারও যদি ফিরে আসি ছফুরা মেয়েটিকে খুঁজে বের করব। তাকে নিয়ে তার সংসার দেখে আসব। কথাগুলি ময়েটাকে বলে যেতে পারলে ভালো হতো। রাত বাড়ছে, মেয়েটা আসছে না। সে হয়তো আর আসবে না।

কুয়াশা পড়তে শুরু করেছে কুয়াশা ক্রমেই ঘন হচ্ছে। আমি বেঞ্চ থেকে উঠে দাঁড়ালাম ।

এখন মধ্যরাত ।

আমি দাঁড়িয়ে আছি গলির সামনে। ঐ তো কুকুরগুলি শুয়ে আছে। ওরা উঠে দাঁড়িয়েছে। প্রতিটি দৃশ্যই আগের মতো- কোনো বেশকম নেই। যেন আমি সিনেমাহলে বসে আছি। দেখা ছবি দ্বিতীয়বার আমাকে দেখানো হচ্ছে। ঐ রাতে কুকুরগুলির সঙ্গে আমি কথা বলেছিলাম। কী কথা বলেছিলাম মনে পড়ছে না। কিছু মনে পড়ছে না।

• • •

পড়েছে। মনে পড়েছে। আমি বলে ছিলাম-তারপর, তোমাদের খবর কী? জোছনা কুকুরদের খুব প্রিয় হয় বলে শুনেছি, তোমাদের এই অবস্থা কেন? মনমরা হয়ে শুয়ে আছ।

না, এই বাক্যগুলি বলা যাবে না। কুকুররা এখন আর শুয়ে নেই। ওরা দাঁড়িয়ে আছে। তাদের শরীর শক্ত হয়ে আছে। তারা কেউ লেজ নাড়ছে না। তারা হঠাৎ চমকে উলটো দিকে ফিরল। এখন আর এদের কুকুর বলে মনে হচ্ছে না। মনে হচ্ছে পাথরের মূর্তি। আমি যেন হঠাৎ প্রবেশ করছি- প্রাণহীন পাথরের দেশে, যে-দেশে সময় থেমে গেছে। লাঠির ঠকঠক শব্দ পাওয়া যাচ্ছে। আসছে, সে আসছে।

মাথার ভেতরটা টালমাটাল করছে। ফিসফিস করে কে যেন কথা বলছে। গলার স্বর খুব পরিচিত, কিন্তু অনেক দূর থেকে শব্দ ভেসে আসছে বলে চিনতে পারছি না। চাপা ও গভীর গলায় কে যেন ডাকছে, হিমু— হিমু!

'বলুন, শুনতে পাচ্ছি।'

'আমি কে বল দেখি !'

'বুঝতে পারছি না।'

'আমি তোর বাবা।'

'আপনি আমার বাবা নন। আপনি আমার অসুস্থ মনের কল্পনা। আমি প্রচণ্ড ভয় পাচ্ছি বলেই আমার মন আপনাকে তৈরি করেছে। আমাকে সাহস দেবার চেষ্টা করছে।'

'এইগুলি তো তোর কথা না রে ব্যাটা। এগুলি মিসির আলির হাবিজাবি। তুই চলে আয়। চলে আয় বলছি।'

'না।'

'শোন হিমু। তুই তোর মা'র সঙ্গে কথা বল। এইবার আমি একা আসিনি। তোর মাকে নিয়ে এসেছি।'

'কেমন আছ মা?'

অদ্ভূত করুণ এবং বিষন্ন গলায় কেউ-একজন বলল, ভালো আছি।

• • •

'মা শোনো— তোমার চেহারা কেমন আমি জানি না। আমার খুব জানতে ইচ্ছে করে তুমি দেখতে কেমন। তুমি কি জান আমার জন্মের পরপর বাবা তোমার সব ছবি নষ্ট করে ফেলেন যাতে কোনোদিনই আমি জানতে না পারি তুমি দেখতে কেমন ছিলে?'

'এতে একটা লাভ হয়েছে না? তুই যে-কোনো মেয়ের দিকে তাকাবি তার ভেতর আমার ছায়া দেখবি।'

'মা, তুমি দেখতে কেমন?'

'অনেকটা কদম মেয়েটার মতো।'

'ওকে আমি দেখতে পাইনি।'

'জানি। হিমু শোন-তুই ঘরে ফিরে যা।'

'না।'

'তোর বাবা তোকে নিয়ে অনেক স্বপ্ন দেখে- তার সব স্বপ্ন নষ্ট হয়ে যাবে।'

লাঠির ঠকঠক আরও স্পষ্ট হলো। মা'র কথাবার্তা এখন আর শোনা যাচ্ছে না। লাঠির শব্দ ছাড়া পৃথিবীতে এখন আর কোনো শব্দ নেই। দেখা যাচ্ছে- কুৎসিত ঐ জিনিসটাকে দেখা যাচ্ছে। সেও আমাকে দেখতে পেয়েছে- ঐ তো সে লাঠি উঁচু করল। চাঁদের আলোয় তার ছায়া পড়েনি। একজন ছায়াশূন্য মানুষ।

আমি পা বাড়ালাম। কুকুররা সরে গিয়ে আমার যাবার পথ করে দিল । আমি এগুচ্ছি। আর মাত্র কিছুক্ষণ, তার পরই আমি তার মুখোমুখি হবো। আচ্ছা, শেষবারের মতো কি চাঁদের দিকে তাকিয়ে দেখব- আজ রাতের জোছনাটা কেমন?

(সমাপ্ত)